যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক

কাজী শওকত শাহী

যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক

কাজী শওকত শাহী

JASHORER JASASWI SHILPI O SHAHITYK

KAZI SHAWKET SHAHI

প্রকাশনে ঃ আফিফা আমিনুন নাহার এম, এ
এ ১৭৬, উপশহর, যশোর

প্রকাশন ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ উষা কম্পিউটার যশোর

ছবি বিন্যাসে ঃ ডিজাইন গ্রাফিক্স এন্ড এ্যাডভারটাইজিং ঢাকা

মুদ্রণে ঃ কাকলি প্রেস, খুলনা

প্রচ্ছদ অঙ্কনে ঃ মুস্তাফা মনোয়ার
(প্রাক্তন এম ডি বাংলাদেশ টেলিভিশন)

উৎসর্গ

আমার পুত্র
আকাশ কাজী
দীপন কাজী কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আমাকে সৃষ্টি, লালন পালন জ্ঞান দান সহ এই গ্রন্থটি প্রণয়নের প্রেরণা ও সার্বিক শক্তি যুগিয়েছেন। তাঁর কাছে লাখো লাখো শুকরিয়া।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে অনুপ্রানিত করেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পিতা কাজী আনোয়ার আহমদ, মাতা জাহানারা বেগম, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যশোরের কৃতী সন্তান প্রফেসর মোঃ শরীফ হোসেন, মাগুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আব্দুব শুকুর, অধ্যাপিকা নার্গিস বেগম, অধ্যাপিকা আম্বিয়া আফলাতুন নাহার, অধ্যাপিকা হাসিনা খালেক, অধ্যক্ষ আব্দুল গফফার, উপাধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল করিম, উপাধ্যক্ষ মশিউল আযম, জিন্নাত আরা জামান, যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রধান মূল্যায়ন অফিসার নজরুল ইসলাম, যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউশনের প্রবীন শিক্ষক শ্রী তারাপদ দাশ, যশোর শিক্ষা বোর্ডের উপ কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক মীর্জা ইলিয়াস বেগ, অধ্যাপক আব্দুল কাদের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহম্মদ আলমগীর, অধ্যাপক কাজী আলতাফ হোসেন, অধ্যাপক কামরুজ্জামান গোরা, কাজী মোহম্মদ আলী বাদশাহ, কবি মোঃ আখতার উজ জামান বাদশা, যশোর শিক্ষা বোর্ডের ক্রীড়া অফিসার মোহাম্মদ শফিকউজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু সালেহ তোতা (ভেনাস অটো), মোঃ আসাদুজ্জামান (গোল্ডেন অটো), ও আব্দুল হালিম শিকদার (নিপা ইলেক্ট্রোনিক্স)। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

"যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক" গ্রন্থটি বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে যাঁদের সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রফেসর আব্দুল নইম, অধ্যাপক মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, এ্যাডভোকেট বদিউজ্জামান খান, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক আসাদুল হক, নজরুল ইনস্টিটিউট কর্মকর্তা নুরুন নবী, আলোক চিত্র শিল্পী মোঃ শফী, অধ্যাপক আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক গাজী এলাহী বক্স, অধ্যাপক নওয়াব আলী, শেখ আব্দুল করিম (যশোর পাবলিক লাইব্রেরী) শিক্ষক মানিক লাল মল্লিক, নরেন্দ্র নাথ হালদার, এম, শহিদুল ইসলাম মিরর ও বাবু প্রবীর পাল।

গ্রন্থটির তথ্য সংগ্রহের জন্য কলকাতায় অবস্থান কালে ব্যাপক ভাবে সহযোগিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের উপ সচিব শ্রী সমীর কুমার রায় চৌধুরী। তাঁর এ বদান্যতার জন্য বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এ সময়ে আরো যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে বেঙ্গল পাবলিসার্স এর পরিচালক ময়ুখ বসু, কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ সোনালী ব্যাংকের নাজমুন নাহার ইলা ও জাহাঙ্গীর হোসেন বিশেষ স্মরণীয়।

গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী আফিয়া আমিনুন নাহার যে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যে সমস্ত ব্যক্তি গ্রন্থটি প্রণয়নেরক্ষেত্রে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন এবং যে সমস্ত লেখকের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়ে গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি, সে সমস্ত মহৎ প্রাণ ব্যক্তি বর্গকে।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

শিল্প সাহিত্যের চিরকালীন নন্দনভূমি যশোরের অসংখ্য শিল্পী সাহিত্যিকের মধ্যে ছাব্বিশ জন যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবন চরিত নিয়েই আমার এ গ্রন্থ "যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক" ।

আর যাঁদের কথা বলার জন্যে বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে উঠলো না অনুকূল অবকাশে তাঁরা অবশ্যই উঠে আসবেন আপন আপন রূপরসে, বর্ণে গন্ধে বৈচিত্রে বৈশিষ্ট্যে।

"যশোরের যশস্বী শিল্পী ও সাহিত্যিক" গ্রন্থে যশোর বলতে বৃহত্তর যশোর জেলার কথাই বলা হয়েছে । যে যশোর বলতে বোঝাতো যশোর সদর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল, এই চারটি মহকুমার একত্রে একুশটি থানা ।

অঞ্চল বিশেষের পরিচিতি পর্বে জেলা যশোরের কৃতী সন্তানদের গুণগানই এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নয় মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সুনাম সুখ্যাত সূতিকাগার হিসেবে যশোরের সু -প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য সন্তানদের পরিচয় নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা । তাঁদের জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁদের স্মরণে নিজেদের সুন্দর করা ও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হওয়া ।

তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে । এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতে বসবাসকারী জীবিত শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ যোগাযোগের চেষ্টা কিছু কম করিনি তারাও প্রত্যেকে আমার এই আহবানে যে ভাবে সাড়া দিয়েছেন, তারও তুলনা মেলা ভার । পরলোকগত শিল্পী— সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন সহ ওয়াকিবহাল মহলের সঙ্গে যোগাযোগেও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি । এ ছাড়া সাহায্য নিয়েছি বিভিন্ন তথ্য সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্রিকার ।

আলোচিত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রত্যেকেরই প্রতিকৃতি সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছি ব্যাপক ভাবে । কিন্তু শত চেষ্টাতেও দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ লুৎফর রহমানের কোন ছবি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি ।

ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণের কথা গর্বভারে বলার দিন কবে আসবে জানিনা · তবে আমার গ্রন্থে ব্যাপক চেষ্টা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভাবে যে সব মুদ্রণ ত্রুটি ঘটেছে তার জন্যে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত ।

আল্লাহর ইচ্ছায় যদি কখনো গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন আরো বৃহৎ কলেবরে আকর্ষনীয় করে নির্ভুল ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করবো । ভুল ত্রুটি ও অপূর্ণতার মাঝেও পাঠক সমাজ যদি গ্রন্থটির দ্বারা কিছু মাত্র উপকৃত হন, তবেই এ গ্রন্থ প্রণয়নের সার্থকতা উপলব্ধি করবো ।

বসন্ত বিহার
এ—১৭৬, উপশহর
যশোর ।

কাজী শওকত শাহী
প্রভাষক ইতিহাস বিভাগ
নওয়াপাড়া কলেজ, যশোর ।

সূচীপত্র

সাহিত্যিক

শিল্পী

সাহিত্যিক



বাউল কবি লালন শাহ্

[১৭৭২ - ১৮৯০ খ্রীঃ]

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম পাখীর পায়।।

দেহ-খাঁচায় বন্দী এক অচিন পাখীকে নিয়ে ভাবুকের ভাবনার শেষ নেই। শেষ নেই কেমন করে এই খাঁচার ভিতর সে আসে আর যায় তা নিয়ে। যাঁর ভাবে ভাবনায় গানের গুঞ্জনে প্রাণের সেই আকুতি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে- মনের মানুষের সংগে মিলনের কামনা যাঁর দীর্ঘ দিনের-আরশী নগরের পড়শীকে যিনি দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তাঁকেই আমরা লালন বলে জানি। তিনি লালন করেছেন আমাদের অন্তর্বাসী অন্তরঙ্গ জনের স্বরূপ সমুদঘাটনের সদিচ্ছা-ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর অচেনা অধরা রূপকে ভাবে ভাষায় সুরে সঙ্গীতে প্রাণময় করে তুলতে। একতারা হাতে একলা চলা বাউলের এই খুঁজে বেড়ানো মনের মানুষের স্বরূপ জানতে হলে লালনকে না জেনে কি আর উপায় আছে ?

বাংলার বাউল গান যাঁর দরদী দানে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে; ভাবুকের ভাবনা যাঁর অন্তরের স্পর্শে মুগ্ধ মোহনীয়তা সৃষ্টি করেছে সেই লালনকে ঘিরে

কথা আর কিংবদন্তীর শেষ নেই। শেষ নেই বিতর্ক অনুমান আর গবেষণার-কে তিনি-কোথায় কবে তাঁর জন্ম-কোথায় কিভাবে তাঁর জীবনের গোত্রান্তর আব রূপান্তর-কিভাবে কেটেছে তাঁর ভাব ভোলা জীবন-রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সত্যিকার সাক্ষাৎ ঘটেছিল কিনা-আর কি ভাবে তাঁর জীবনের পবিসমাপ্তি ঘটেছিল তা নিয়ে। সেই সব হারানো হদিস হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ করে খোঁজ পাওয়া গেল তাঁরই প্রিয় শিষ্য দুদ্দু শাহেব বচন-বিবৃতি আর বিভিন্ন- প্রাসঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ। লালন শাহেব পবিচিতি মূলক দুদ্দু শাহের বিবৃতির কিছু অংশ উদ্ধৃত কবা হলোঃ-

এগার শো উনআশি কার্তিকের পহেলা
হরিষপুর গ্রামে সাঁইর আগমন হৈলা।
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়
উক্ত মহাকুমাধীন হরিষপুর হয়।
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার
বংশ পবম্পবা বাস হরিষপুর মাকার।
দরীবুল্লা দেওযান তার আব্বাজির নাম
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।

* * * * *

বারশত 'সাতানব্বই' বাংগালা সনেতে
পহেলা কার্তিক শুক্রবার দিবাঅন্তে
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
ওফৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল।

লালনশাহের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত যে সমস্ত বাক বিতন্ডা চলে আসছিল, দুদ্দু শাহ'র বিবৃতি, প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ ও আধুনিক কালের গবেষকদের লিখিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি থেকে এসব সমস্যার সমাধান হবে বলেই বোধ করি।

সুর সাধক বাউল-সম্রাট লালন শাহ বাংলা ১১৭৯ সালের পহেলা কার্তিক, ইংরাজী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যশোর জেলার ঝিনাইদহ (বর্তমান জেলা) মহকুমার হরিনাকুণ্ডু থানার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দরীবুল্লাহ দেওয়ান ও মাতা আমেনা খাতুনের চার ছেলের তৃতীয় সন্তান লালন শাহ্। শৈশবেই ঘটে তাঁর মাতৃবিয়োগ।

শৈশব কাল থেকেই লালন ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির ও সংগীত অনুরাগী। হরিশপুর এলাকায় তখন কবিগান, জারি গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। বিখ্যাত বয়াতীদের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হতো। লালন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনের পর দিন এই সব গান শুনে বেড়াতেন। একদিন এই সুরের মাদকতায় তিনি বেছে নিলেন ছন্নছাড়া বাউল জীবন।

ভবঘুরে লালনকে সংসারে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর ভাইয়েরা হরিশপুর নিবাসী গোলাব শাহের কন্যা বিসখা বেগম এর সংগে তাঁর বিবাহ দেন। তাঁর এই স্ত্রী অকালে মৃত্যু বরণ করলে তিনি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামের মতিজান বিবিকে বিবাহ করেন। মৃত্যুর পরে মতিজান বিবিকে লালনের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। কুষ্টিয়াতে এখনও তাঁর কবর লালনের সমাধির পাশেই সংরক্ষিত আছে।

লালনের গুরু ছিলেন সিরাজ সাঁই। সিরাজ সাঁইও একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁকে গড়ে তোলেন নিজ আদর্শে।

লালনের সুর ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল। বাউল লালন সারাটি জীবন স্রষ্টার নৈকট্য লাভের তীব্র বাসনায় সুর সেধেছেন, রচনা করেছেন অসংখ্য বাউল গান:

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।।
আমি জনম ভ'রে একদিন না দেখলাম তারে।।
নড়েচড়ে ঈশান কোণে,
দেখতে পায়নে দুই নয়নে,
হাতের কাছে যার ভবের হাট-বাজার,
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।।

লালন শাহ বাংলা লোক সাহিত্যের এক উজ্জ্বল তারকা। তাঁর গানে তিনি অজস্র উপমা ব্যবহার করেছেন। লোক সাহিত্যে তাঁর মত প্রতিভা খুব কমই

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন লালন ভক্ত। সুধী সমাজে রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালন গীতিকে উপস্থাপন করে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে লালন সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর "ছন্দ" গ্রন্থে লালনের গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শিলাইদহে থাকাকালীন এই মরমী গায়ক সম্পর্কে জেনেছিলেন। কবির হৃদয়ে লালন গীতির এত প্রভাব পড়েছিল যে, কবির অনেক সাহিত্যকর্মে তাঁর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কবির "জীবন দেবতা' এবং লালনের "অচিন পাখী" সম্ভবতঃ একই চেতনার ফসল।



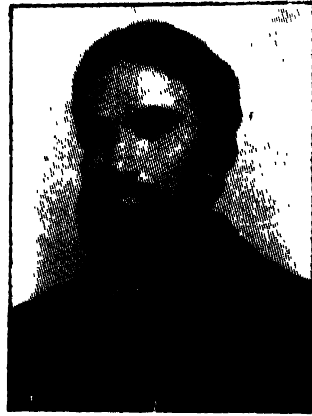
লালন শাহ্ এর মাজার

লালন শাহের গানের সঠিক সংখ্যা আজও নিরুপণ করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরে অনেকেই লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৮৯টি গান সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর মধ্যে কুড়িটি গান ১৩২২ সনে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাউল শিরোমণি লালন শাহ দীর্ঘায়ু ছিলেন: তিনি বাংলা ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক, ইংরেজী ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে তাঁর মাজার।

লালনগীতি সাময়িকভাবে আপাতদৃষ্টিতে উপেক্ষিত বলে বোধ হলেও তার একতারার সুর আজ বিশ্ব বরেণ্য আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্যের আসরে আলোচনার বিষয় বস্তু। লালন মাটির কবি মানুষের কবি, তাই মাটির মানুষের কন্ঠে কণ্ঠে তাঁর গান আজও ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কত দিনে।
চাতক-প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালো শশী
হব বলে চরন দাসী।
তা হয়না কপাল গুণে।
আমার মনের মানুষের সনে।।



কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

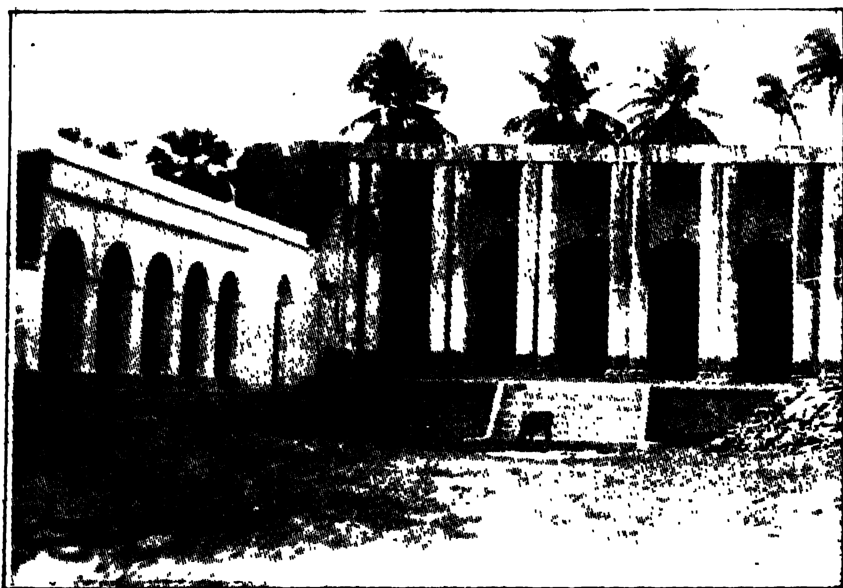
(১৮২৪-১৮৭৩খ্রীঃ)

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে; তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম। মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত্ত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে- জননী জাহ্নবী।

বঙ্গের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারী শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজ নারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন নামকরা আইন ব্যবসায়ী। মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন তৎকালীন যশোর জেলার অর্ন্তগত কাঠিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা।

শিশুকালে মধুসূদনের হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে। এরপর তিনি তাঁর গ্রামের নিকটবর্তী শেখপুরা গ্রামের এক মৌলভী শিক্ষকের নিকট ফারসী শিখতে যেতেন। চণ্ডীমণ্ডপের শিক্ষা ও মৌলভী শিক্ষকের

শিক্ষায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত সেখানে ইংরাজী ও ফারসী অধ্যয়ন করেন। এই সময় খিদিরপুরে তাঁদের নিজের বাড়ীতেই তিনি বসবাস করতেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী কবি মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় তিনি হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরস্থ বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং চার বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ব করেন।



কবি মধুসূদন এর জন্মভূমি সাগরদাড়ীর বাড়ী

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 'Circulator' পত্রিকায় তাঁর অনুদিত পারস্যের কবি শেখসাদীর একটি গজল "Ode" নামে প্রকাশিত হলে ইংরাজী রচনায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় মাইকেল পিতার অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পারিবারিক স্নেহের নোঙ্গর ছিঁড়ে মাদ্রাজের পথে পাড়ি জমান। এখানে প্রথমে মাদ্রাজ "মেল

অরফ্যান অ্যাসাইলাম" বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। মাদ্রাজে প্রবাসকালে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা উজ্জীবিত হয়ে উঠে। এই সময়ে তিনি লিখলেন ইংরাজী কাব্য "Captive Lady" ও "Visions of the past." । এখানে তিনি কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইংরাজী ভাষায় প্রথম নাটক "Rizia" (Empress of India) এখান থেকেই প্রকাশিত হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অবস্থানকালে তাঁর লোকাতীত গুণে বিমোহিত হয়ে নীলকর কন্যা রেবেকা তাঁকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করেন। কিন্তু এ বন্ধন ছিল ক্ষণিকের। অল্পদিন পরেই তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তীতে তিনি এক ইউরোপীয় সুন্দরী রমনী হেনরীয়েটাকে বিবাহ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন সস্ত্রীক কোলকাতায় গমন করেন। কলকাতায় এই স্ত্রীর গর্ভে কবি মধুসূদনের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

কলকাতায় ফিরে এসে কবি দেখলেন, তাঁর পিতা-মাতা ইতঃপূর্বেই ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের অনেক সম্পত্তি অন্যেরা দখল করে নিয়েছেন। অগত্যা মধুকবি পুলিশ আদালতে সামান্য কেরানীর চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক "শর্মিষ্টা" লিখিত হয় এবং বেলগাছিয়ার নাট্য শালায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এর দুই মাসের মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং তার অল্পকাল পরেই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামে দুটি প্রহসন রচিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন পদ্মাবতী, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে "কৃষ্ণকুমারী" নাটক। বাংলা নাটকের দৈন্যদশা মোচনের অঙ্গীকার নিয়েই কবি এ নাটকগুলি রচনা করেছিলেন।

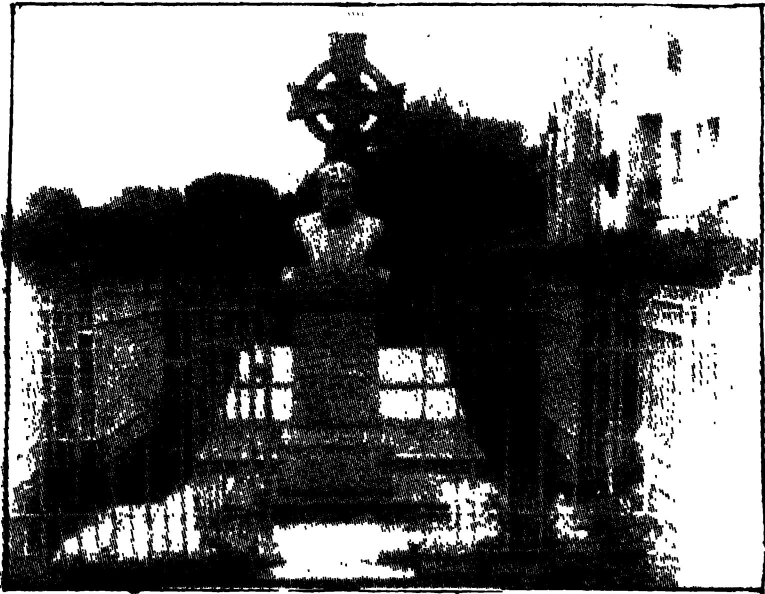
বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি মধুসূদনের বিচিত্র শৈল্পিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" প্রকাশের মাধ্যমে। কবি মধুসূদনের অমর কীর্তি বিস্ময়কর সৃষ্টি "মেঘনাদ বধ" কাব্য। এই মহাকাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কবি মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়। মহাকবির

"তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" "মেঘনাদ বধ" কাব্য –এ দুটিই সাহিত্যরস সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য কাব্য। "মেঘনাদ বধ' কাব্যে ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। রামচন্দ্র সম্পর্কে প্রচলিত ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অনেক কঠিন বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখানে ছন্দ শৈলী বিচিত্রতায় মহিমাপূর্ণ। "মেঘনাদ বধ" কাব্য থেকে ঃ–.

দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবনে ? দেব কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল–মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেবহাস্য উজলিছে; দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব–অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ প্রসাদে;
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব–আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?

মহাকাব্যের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহিত্যিক জীবনে স্বদেশে খ্যাতি ও যশ লাভ করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। দুর্বার উচ্চাকাঙ্খা ও অপরিতৃপ্ত বাসনা তাঁর শৈল্পিক স্বত্তাকে স্বদেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের ৯ তারিখে ব্যারিষ্টারী পড়ার মনোবাসনায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কলকাতায় রেখে বিলাত যাত্রা করেন। যে আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাসে মধুসূদন বিলাত যাত্রা করেন, অচিরেই তা ভঙ্গ হলো। তাঁর ভূসম্পত্তির পত্তনীদার ও প্রতিভূরা তাঁকে বিলাতে ও তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের ২ তারিখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দুটি শিশু সন্তানসহ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরীয়েটা

কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ডে স্বামীর নিকট গিয়ে পৌঁছালেন। ব্যাপক অর্থসংকটের কারণে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ মাইকেল মধুসূদন প্রথমে ফ্রান্সের প্যারী ও পরে ভার্সাই নগরীতে যান। দেশ থেকে অর্থ না আসায় তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ল যে, স্ত্রীর গহনা, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এমনকি বই পুস্তক পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়। অবস্থা এমন চরম আকার ধারণ করে যে, কপর্দকহীন অসহায় অবস্থায় ঋণের দায়ে তাঁর জেলে যাবার উপক্রম ঘটে।



কলকাতার পার্ক সার্কাসে খৃষ্টান গোরস্থানে কবি মধুসূদন ও স্ত্রী হেনরীয়েটার সমাধি

এই দুর্দিনেও তিনি সৃষ্টি বিমুখ ছিলেন না। বাংলা সনেট (চতুর্দশপদী) এর সার্থক স্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থান কালেই ইতালির কবি পেত্রার্কের সনেট থেকে অনুপ্রানিত হয়ে প্রথম বাংলা সনেটের দিগন্ত উম্মোচন করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই চতুর্দশপদী কবিতা গুলিতে কবি চিত্তের ব্যাকুলতা, স্বদেশ প্রেমিকতা ও আবেগ ধ্বনিত হয়েছে।

নিচের চতুর্দশপদী কবিতাংশে কবি স্মরণ করেছেন জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা ঃ–

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া–মন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ–দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ–স্রোতোরূপী তুমি জন্ম–ভূমি–স্তনে!

মধুসূদনের দুর্দিনে একমাত্র সুহৃদ ছিলেন বিদ্যাসাগর। আপন অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বহু অর্থ ব্যয় করেন তিনি মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য। লণ্ডনের 'গ্রেজ ইন' থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করে দেশে ফিরে ১৭–১১–১৮৬৬ তারিখে কোলকাতা বারে যোগদান করেন এবং ৭–৫–১৮৬৭ তারিখে হাইকোর্ট বারে যোগদান করেন। পরে তাঁকে প্রিভি কাউন্সিলের "আপীল এগজামিনার" হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট অগ্রদূত বাঙ্গালী মনীষীর এক বিস্ময়কর নিদর্শন, বাঙ্গালী তথা বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকেন। পাশের কক্ষে স্ত্রী প্রাণপ্রিয়া হেনরীয়েটা শয্যাশায়িনী অথচ চিকিৎসা করার মত সামর্থ তাঁর নেই। শেষ অবধি কবি আশ্রয় নিলেন আলীপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন মৃত্যু শয্যায় শায়িত মধুসূদন শুনতে পেলেন স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ। তখন তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে শোকাশ্রু। স্ত্রীর মৃত্যুর তিনদিন পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুন রবিবার অপরাহ্ন প্রায় দুই ঘটিকার সময় জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত কবি মধুসূদনের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। শেষ হয়ে গেল নিয়তি নির্ধারিত এক অভাবিত ট্রাজেডী।

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

[১৮৮৯–১৯৩৬ খ্রীঃ]

" মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, মোনাফেকের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সমস্ত ধন–সম্পদের বিনিময়ে শয়তানের মুখের সঙ্গে আমার মুখ বদলাতে চাইনে।" 'মানবজীবন' গ্রন্থে 'শয়তান' নামক প্রবন্ধে এই মহৎ বাণীর প্রবক্তা বাংলা সাহিত্যের নীতিবাদী সাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমান যশোরের কৃতী সন্তান।

ডাঃ লুৎফর রহমান যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ খৃীষ্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ময়েনউদ্দীন জোয়ার্দ্দার ছিলেন ষ্টেশন মাষ্টার ও মাতা সামসুন্নাহার বেগম। লুৎফর রহমানের পৈত্রিক নিবাস তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার হাজীপুর গ্রামে।

তাঁর বাল্য শিক্ষার সূচনা হয় হাজীপুর এম, ই স্কুলে। মাগুরা উচ্চ ইংরেজী (বর্তমান সরকারী) স্কুলে তিনি কিছুদিন পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে হুগলী উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই এন্ট্রান্স পাস করেন। অতপর তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ডাঃ লুৎফর রহমান এ সময়ে সমাজ সেবায় এত বেশী নিয়োজিত ছিলেন যে পাঠ্য পুস্তক পড়ার সময় পর্যন্ত তাঁর হতো না। যার কারণে এফ, এ (আই, এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বাড়ীর কাছেই কুমার নদী; ঋতুতে ঋতুতে তার বৈচিত্র রূপ দেখে তিনি মোহিত হতেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে নদীতে চর জাগে, ধু ধু করে বালুচর। বর্ষায় নদীর ভয়ংকর রূপ তিনি দেখেছেন-দেখেছেন নদীর দু'কূল ঘেসে সজল সবুজ ধানক্ষেত, প্রথম শীতে মাঠের সোনালী ফসল। প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা বালক লুৎফর রহমানকে সাহিত্য পিয়াসী করে তোলে।

লেখক হওয়ার তীব্র বাসনা তাঁর কিশোর মনকে অধিকার করেছিল। সাহিত্য জগতে তাঁর প্রথম আগমন ঘটে বৃহৎ ডন কুইকজোটের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম এবং শেষ কাব্য গ্রন্থ " প্রকাশ" নামে চল্লিশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। এই কাব্য গ্রন্থের "বাল্য ছবি" কবিতাটিঃ-

মনে হয় সেই দেশে ফিরে আমি যাই,
আবার সে সখাগনে ডাকিয়া শুধাই।
সে কথার বাত্যাহত তরু-সঞ্চালন,
সে কথার কথা-ভরা বন উপবন,
হাসি-গান- মুখরিত সাঁঝের আঁধার,
মাতার সে স্নেহময় শাসন-চীৎকার,
মৌন বনে ভাষাময় মশক-সঙ্গীত-
বাল্য প্রাণ ক'রে দিত কেমন মথিত!
সুখদ সে মধু-দৃশ্য অতীত সুন্দর
লয়ে আসে শত ব্যথা প্রীতি মনোহর।
দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আগাছায় জোড়া
মনে হয় ছিল তাতে কত সুধা পোরা।

শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। সিরাজগঞ্জের বি, এল ইনিসটিটিউশনে সামান্য বেতনে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করার পর

চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। হাজীপুরের আয়েশা খাতুন নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা কে তিনি বিবাহ করেন। সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে ৫১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাসায় বসবাস শুরু করেন এবং হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী আরম্ভ করেন।

জীবনে দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও লুৎফর রহমানের লিখনী থেমে থাকেনি; ক্রমাগত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ব্যর্থতা হতাশা কখনো থামতে দেয়নি তাঁকে। প্রেরণা এসেছে কখনও অন্তর থেকে কখনও বাইরে থেকে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সরলা' উপন্যাস। এখানে তিনি একটি পথ ভ্রান্ত নারীর জীবনের সমস্যা এবং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন। ১৯১৯ সালে তাঁর 'পথহারা' ও 'রায়হান' নামে দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় "প্রীতি উপহার" উপন্যাসটি। নারী গৃহলক্ষী পুরুষের প্রেরণা দাত্রী পারিবারিক জীবনে নারী গড়ে তোলে সুখের ভুবন। তাই আদর্শ নারী–সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভিন্নধর্মী উপন্যাস হিসাবে "প্রীতি উপহার" বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। "বাসর উপহার," "প্রতিশোধ" নামে এসময় তিনি আরও দুটি উপন্যাস রচনা করেন।

জাতি গঠনে নারী সমাজের অগ্রণী ভূমিকার কথা তিনি ভোলেননি। তিনি চেয়েছিলেন নারী জাতিকে মুক্তি দিয়ে, স্বাধীনতা দিয়ে জাতি গঠনের জন্য আদর্শ শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলা ১৩১৯ সনের আশ্বিন মাসে 'নারী শক্তি' নামে একটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়াও নারীদের বিশেষ করে পতিতাদের মঙ্গলার্থে কলকাতার বাড়ীতে 'নারী তীর্থ' ও 'নারী শিল্প শিক্ষালয়' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা তৎকালীন সুধী সমাজে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয় কিন্তু দারিদ্রতার জন্যই তাঁর এ প্রতিষ্ঠান দুটি বন্ধ হয়ে যায় এবং বিশেষ অবস্থার স্বীকার হয়ে তিনি কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

শিশু কিশোরদের জন্য তিনি বেশ কিছু আত্মচরিত ও ইতিহাস ভিত্তিক আদর্শ গ্রন্থাবলী রচনা করেন। এ গুলির মধ্যে "ছেলেদের মহাত্ম কথা"

(১৯২৯) "ছেলেদের কারবালা" (১৯৩১) "রানী হেলেন" (১৯৩৫) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তার লুৎফর রহমানের সাহিত্য চেতনা তাঁর জীবন আর্দশের একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নীতিবাদী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র ভুবন সৃষ্টি করে সাহিত্যের মৌলিকত্ব নির্মাণ করেছেন। সাধারন মানুষের দুঃখ বেদনা ও তাঁদের সমস্যা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি ব্যক্তি মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য রচনা করেন 'উন্নত জীবন,' 'মানব জীবন,' 'মহৎ জীবন' ইত্যাদি। ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে উন্নতশিরে বলীয়ান করে তোলার বাসনায় তিনি রচনা করেন 'ব্যক্তি জীবন,' 'সমাজ জীবন,' 'ধর্ম জীবন,' 'যুবক জীবন' প্রভৃতি।

ডাক্তার লুৎফর রহমানের সমগ্র জীবন কেটেছে সুন্দরের অন্বেষায়। জগৎ জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন তিনি। এই দেশ বরেণ্য মানবতাবাদী সাহিত্যিক চরম দারিদ্রতার মুখোমুখি যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৬ সালে ৪৭ বৎসর বয়সে বিনা চিকিৎসায় ইন্তেকাল করেন।



কবি গোলাম মোস্তফা

[১৮৯৭–১৯৬৪ খ্রীঃ]

কবি গোলাম মোস্তফার অতুলনীয় সাহিত্য সৃষ্টি "বিশ্বনবী"। এই অমর গ্রন্থখানি গদ্যে রচিত হলেও সে গদ্যও কবিতার মত ছন্দময় এবং মধুর। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রেনেসাঁর কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। পিতা কাজী গোলাম রব্বানী, পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার। তাঁরা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী–ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত।

কবি গোলাম মোস্তফার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় চার বছর বয়সে নিজগৃহে ও পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালায়। কিছুদিন পরে তিনি ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালাতে ভর্তি হন। দু'বছর এই পাঠশালায় বিদ্যা অর্জনের পরে তিনি ভর্তি হলেন শৈলকূপা উচ্চ ইংরেজী স্কুলে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে তিনি প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দৌলতপুর বি, এল কলেজ থেকে আই, এ এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি, এ পাস করেন। পরে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি, টি ডিগ্রীও লাভ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ব্যারাকপুর সরকারী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসাবে গোলাম মোস্তফার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুর হাই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হন।

দীর্ঘদিন এখানে শিক্ষকতা করার পর তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় বদলী হন। সেখান থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জ সরকারী ডিমনেষ্ট্রেশন হাই স্কুলে বদলী হয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন এবং কয়েক বৎসর পর উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদমর্যদা লাভ করেন। এই বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম মুসলিম প্রধান শিক্ষক। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলে বদলী হন। শিক্ষকতা জীবনে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত কবি গোলাম মোস্তফার অবদান বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। স্কুল জীবনেই এই কবির সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় তাঁর 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "রক্ত রাগ" প্রকাশিত হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নীচের দু'লাইন কবিতার মাধ্যমে কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন–

"তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"

তাঁর পরবর্তী গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'হাস্নাহেনা' (কাব্যগ্রন্থ) 'খোশরোজ' (কাব্যগ্রন্থ), 'সাহারা' (কাব্যগ্রন্থ) 'বুলবুলিস্থান' (কাব্যচয়ন) ও 'রূপের নেশা' 'ভাঙ্গাবুক' 'একমন একপ্রাণ' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

অনুবাদক হিসাবেও কবি গোলাম মোস্তফার বিশেষ খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ও উর্দু সাহিত্য হ'তে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। 'ইখওয়ানুস সাফা' 'মুসাদ্দাস-ই-হালী' 'কালাম-ই-ইকবাল' 'শিকওয়া' 'আল-কুরআন' তাঁর ভাষান্তরিত গ্রন্থগুলির অন্যতম।

এছাড়া, চিন্তামূলক ও যুক্তিবাদের উপর লিখিত আরও কিছু গ্রন্থাবলী তিনি রচনা করেছিলেন। 'ইসলাম ও কমিউনিজম' 'ইসলামে জেহাদ' 'আমার চিন্তাধারা' এগুলি তাঁর গভীর চিন্তাধারার জ্ঞানলব্ধতার ফসল।

কবি গোলাম মোস্তফার "বিশ্বনবী" একটি আশ্চর্যরকমের সফল সৃষ্টি। গ্রন্থখানা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর একটি সার্থক জীবন চরিত। গ্রন্থটিতে হৃদয়ের আবেগ, আন্তরিক অনুভূতি যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তার তুলনা আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।



রেডিও পাকিস্তানে সঙ্গীত পরিবেশনরত কবি গোলাম মোস্তফা

কবি বলতেন বিশ্ব প্রকৃতি ছন্দ ও সুরে পরিপূর্ণ। ছন্দের বৈচিত্রে তাঁর ছিল অসাধারন দখল। কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল তার আত্মিক সম্পর্ক। কবি কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ট সম্পর্ক যদিও লেখনীর মধ্যে উভয়ের চিন্তাধারার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর লিখিত একটি ছড়া ঃ-

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম

ভায়া গান গায় দিনরাত
হেসে লাফ দেয় তিন হাত,
প্রানে হর্ষের ঢেউ বয়
ধরার পর তার কেউ নয়।

এই ছড়াটির মাধ্যমে নজরুলের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এবং কবির ছন্দ বোধও পরিলক্ষিত হয়েছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ক ও গীতিকার হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ইসলামী গান, গজল ও মিলাদ মাহফিলের বিখ্যাত "কিয়ামবাণী" (রসুল আহবান বাণী) রচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর অনেক গুলি গান আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠেও রেকর্ড হয়েছিল। এছাড়া নিজের কণ্ঠেও তিনি বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর রেকর্ডকৃত গানগুলোর প্রথম লাইনগুলি নিম্নরূপঃ–

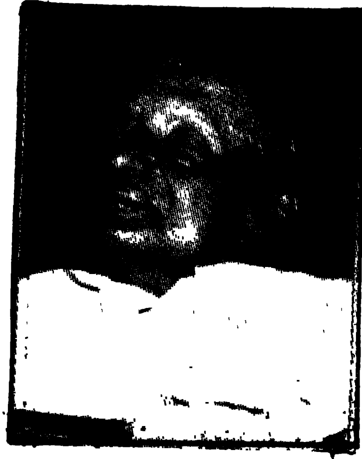
* হে খোদা দয়াময় রাহমানুর রাহিম
* বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার
* নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
* আমার মুহম্মদ রাসুল

কবি গোলাম মোস্তফার বাংলা "কিয়াম বানী" ধর্মীয় মিলাদ মাহফিলে অঙ্গীভূত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর লিখিত কিয়াস বাণীর (গজল গীত) চরণগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ–

ইয়ানবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

তুমি যে নূরের–ই–রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবই।

বাংলা সাহিত্যের সাধক কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর শেষ জীবনের কয়েক বৎসর ঢাকা শান্তিনগরস্থ নিজ গৃহে (মোস্তফা মঞ্জিল) অতিবাহিত করেন। বেশ কিছু দিন রোগ যন্ত্রনা ভোগ করার পর কবি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



মনোজ বসু

[১৯০১–১৯৮৭ খ্রীঃ]

বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মনোজ বসু। বাংলার মাটি, মানুষ, আকাশ, জলপাই রংয়ের গাছ গাছালি, গঙ্গা পদ্মার শব্দ নৈশব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মনোজ বসুর সাহিত্য কর্ম।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালের ৯ই শ্রাবণ (ইংরেজী ১৯০১ সালের ২৫শে জুলাই) যশোর জেলার কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসু জন্ম গ্রহন করেন। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান তিনি। সম্পদ–সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় তা ছিল না তাঁদের। গ্রামে তাঁদের ছিল বংশ গৌরব ও প্রচুর খ্যাতি।

তাঁর ঠাকুর দাদার লেখার অভ্যাস পিতা রামলাল বসুর মধ্যেও ছিল। তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। দুই পুরুষের সাহিত্য চর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজবসুর লেখক হওয়ার পাথেয়। মনোজ বসু সাত বছর বয়সেই বঙ্কিম বাবুর লেখা থেকে অনুপ্রানিত হয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রথম কবিতা ঃ–

তরু
সরু
মরু
নরু।

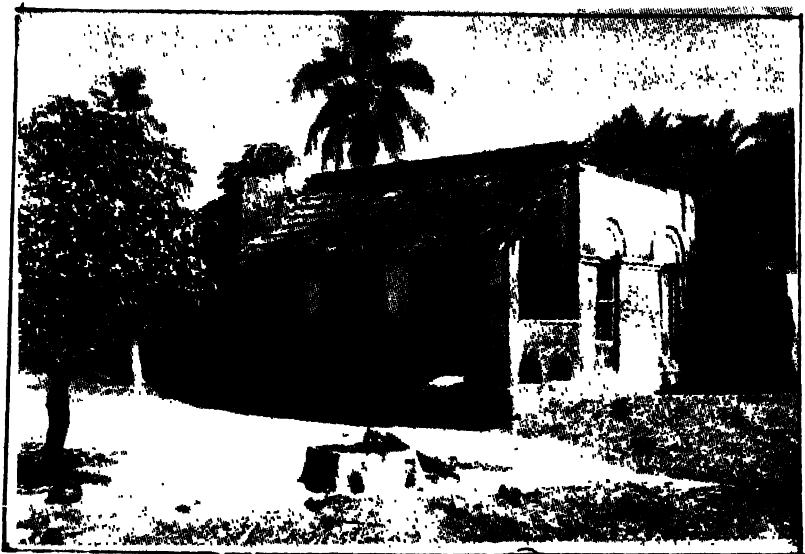
বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাসে মাত্র আট বছর বয়সে লেখক মনোজ বসু হলেন পিতৃহীন। তখনও পাঠশালার গন্ডি শেষ হয়নি। লেখক হওয়ার সাধ, স্বপ্ন, বাসনা সব কিছুর উপর পড়ল যবনিকা। এক নিদারুন অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রথমে নিজ গ্রামে পরে কলকাতায় তাঁর শিক্ষা জীবন চলতে থাকে। কলকাতায় তিনি ভর্তি হন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৯ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি কয়েকটি লেটাব সহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এরপর তিনি বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হন। এই বাগেরহাট কলেজে ছাত্র থাকাকলীন সময়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি আই,এ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯২৪ সালে সাউথ সাবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে ডিষ্টিংশন নিয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুরু করলেন আইন পড়া। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তিনি আইন পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। যোগ দিলেন শিক্ষকতায়। ভবানীপুর সাউথ সাবারবন বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে পরে তিনি পরিপূর্ণভাবে সাহিত্য চর্চার জন্য শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকালীন সময়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লেখার কাজেও মনোনিবেশ করেন। ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীতে তিনি 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

মনোজ বসুর গল্প ও উপন্যাস হৃদয় দাক্ষিণ্যে আবেগ বিহ্বল। স্কুলে পড়াকালীন কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু মিলে একটি হস্ত মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর পর যে পত্রিকার সংশ্রবে তিনি আসেন তা হল "বিকাশ"। ক্ষুদাকায় ডিমাই সাইজের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই মনোজ বসু লিখতে শুরু করেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম "গৃহহারা" লেখক মনোজ মোহন বসু। 'বাঁশরী'র পৃষ্ঠাতেও ঐ নামে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পিতৃ প্রদত্ত নামের মধ্যপদ লোপ করে পরে তিনি মনোজ বসু হলেন। "নতুন মানুষ" (বিচিত্রা কার্ত্তিক, ১৩৩৭) প্রথম পদক্ষেপ হলেও প্রকৃতপক্ষে "বাঘ"-ই মনোজ বসুর কৃতিত্বের

পরিচায়ক- এতেই তাঁর সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা। "বাঘ" গল্পটি সম্পর্কে বিভূতি ভূষন বন্দোপধ্যায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিভূতি ভূষন ও কবি জসীম উদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক।

গল্পের পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছিল মনোজ বসুর সৃষ্টিধর্মী কবিতা। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা "গোপন কথা" হেমলতা দেবী সম্পাদিত মেয়েদের কাগজ " বঙ্গলক্ষ্মী" তে ১৩৩৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

সই কিরা কর, কারেও কবি না -কহিব তব সে কথা।
বিল কিনারায় উড়ে চলেছিল সাদা সাদা বকগুলি
মেঘের গলায় সাতনরী -হার যায় যেন দুলি দুলি।
তুলসীতলায় সন্ধ্যার দীপ বাতাসে কাঁপিয়ে মরে।
এত বড় বাড়ি- কেউ কোথা নাই, দু'জনে একেলা ঘরে।
দূরে বিয়াবাড়ি কত কোলাহল, বাজিতেছে ঢোল কাঁশি।
ও কহে তখন সেই পুরাতন, ভালবাসি, ভালবাসি।



কেশবপুরে ডোঙ্গাঘাটায় মনোজ বসুর বাড়ী

গুরু সদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত "বাংলার শক্তি" পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের শ্রাবন মাসে। মনোজ বসু এই পত্রিকাটি সম্পাদনাসহ "সাহিত্যের খবর' পত্রিকাটিও সম্পাদনা করতেন। তিনি "বাংলা সাহিত্য একাডেমীর' (পশ্চিম বাংলা)সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম এবং কলকাতার নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি সর্ব ভারতীয় ও আঞ্চলিক একাধিক সম্মেলনে পৌরহিত্য করা ছাড়াও অসংখ্য সাহিত্য শিল্প সাংস্কৃতিক সংস্থার পৃষ্টপোষকতা করেছেন।

জীবনে দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কখনও থেমে থাকেনি মনোজ বসুর সাহিত্য চর্চা। মনোজ বসুর সাহিত্য চিন্তা তাঁর জীবন চর্চায় একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন। 'আমি সম্রাট' 'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ' 'নিশিকুটুম্ব' 'নবীন যাত্রা' 'একদা নিশথিকালে' 'কিংশুক' 'মায়াকন্যা' 'বন কেটে বসত' 'রূপবতী' 'সেতুবন্ধ' 'ঝিলমিল' মনোজ বসুর রচনাবলী।

তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল জমা হয়ে আছে "আগষ্ট ১৯৪২" "ভুলিনাই" " সৈনিক" "বাঁশের কেল্লা" এই সকল রাজনৈতিক উপন্যাস গুলিতে। মনোজ বসু ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। ভ্রমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর লিখিত 'ভ্রমন কাহিনী "চীন দেখে এলাম' 'সোভিয়েটের দেশে দেশে' 'নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ' 'পথচলি' বিশেষভাবে সমাদৃত্ত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেশ কযেকটি গ্রন্থ হিন্দী, ইংরেজী, গুজরাটি, মারাঠা, মালুয়ালম ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

স্বদেশে ও বিদেশে লেখক পেয়েছেন অভাবনীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার। 'একাডেমী পুরস্কার' ও 'নরসিংহদাস' পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' অমৃত বাজার পত্রিকা প্রদত্ত 'মতিলাল ঘোষ' পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। জগৎ ও জীবনের রূপকার মনোজ বসু তাঁর লেখনীতে বিচিত্র রামধনু এঁকেছেন, সৃষ্টি করেছেন রোমান্টিক সাহিত্য জগৎ। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ মনোজ বসু ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।



কবি কাদের নওয়াজ

[১৯০৯-১৯৮৩ খ্রীঃ]

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি কাজী কাদের নওয়াজ ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে।

পিতা কাজী আল্লাহ নওয়াজ এবং মাতা ছিলেন ফাতেমুন্নেছা। কবি কাদের নওয়াজের পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই ছিলেন জ্ঞানী ও সাহিত্যসেবী।

কবি কাদের নওয়াজের শিক্ষারম্ভ হয় নিজ গৃহে। ১৯১৮ সালে তিনি বর্ধমান জেলার মাথরুন উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। কবি নজরুল ইসলামও এক সময় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এ স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ১৯২৩ সালে এখান থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯২৯ সালে বহরমপুর থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবর্তীতে বি,টি ও ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে স্কুল সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। তার পর দীর্ঘদিন তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ইংরাজীর শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) চলে আসেন এবং প্রথমে ঢাকায় নবকুমার ইন্‌সটিটিউটে (বর্তমানে নওয়াবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়) যোগ দেন। ১৯৫১ সালে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দিনাজপুর

সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি দিনাজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে যশোর জেলার (বর্তমান মাগুরা জেলা) শ্রীপুর থানার মুজদিয়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নিজ এলাকার স্কুল শ্রীপুর মহেষচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পারিবারিক সাহিত্যামোদী পরিবেশেই বসে কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন কাদের নওয়াজ। চাচা নওয়াজ খোদা বিখ্যাত লেখক ও ফারসী ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতা আল্লাহ নওয়াজ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বহুভাষী এবং মা ফাতেমুন্নেসার মধ্যেও কবি প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও স্কুল শিক্ষক দ্বীজবাবুর অনুপ্রেরণাও ছিল কবি কাদের নওয়াজের লেখক হওয়ার পাথেয়।

১৯২১ সালে শিক্ষক দ্বিজবাবুর উৎসাহে "স্বদেশ প্রীতি" নামে 'বিকাশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে ছোটদের বিখ্যাত পত্রিকা মাসিক "শিশু সাথী"-তে "ঘুমপাড়ানীয়া গান" নামে কবিতাটি ছাপা হলে সাহিত্য সমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, "ঘুমপাড়ানীয়া গান" কবিতাটির কিছু অংশ –

চাঁদের আলোয় ফিন ফুটেছে
চকোর উড়ে যায়,
ঝিরঝিরিয়ে বইছে হাওয়া
আয়রে ও ঘুম আয়।
নীল আকাশের অসীম শেষে
মেঘগুলো সব হাওয়ায় ভেসে
কোন্ অজানা পরীর দেশে
খবর নিয়ে যায়–
বাইরে কোথাও নাইরে সাড়া
আয়রে ও ঘুম আয়।

কবি কাদের নওয়াজের মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অনেক কবিতায়। তৎকালীন "শিশু সাথী"-তে প্রকাশিত এরকম একটি কবিতাংশ -

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
তিন ভুবনে নাই।
সত্য ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার পরে আজি
অন্তরে 'মা' থাকুক মম
ঝরুক স্নেহ-রাজি।

শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের প্রতি তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবন ও আদর্শ প্রাণ। শিক্ষা ও শিক্ষকদের মর্যাদার উচ্চ আসনে সু-প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে তিনি লিখেছেন "ওস্তাদের কদর" নামক বিখ্যাত কবিতাটি।

বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রতিটি ভাষাতেই তাঁর ছিল অপার পাণ্ডিত্য। ভারত ও বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁর অসংখ্য কবিতা ও বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "মরাল" কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে "নীল কুমুদী" কাব্য গ্রন্থটি দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে ছোটদের জন্য লেখা তাঁর "দাদুর বৈঠক" ও "দস্যু লাল মোহন" প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস "উতলা সন্ধ্যা" ও ১৯৭৩ সালে ঢাকা থেকে "দুটি পাখি দুটি তীরে" প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তার অপ্রকাশিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁর অনেক কবিতা স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত কবিতা "হারানো টুপি" কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

কবিতাটির অংশ বিশেষ ঃ-

টুপী আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাইরে

বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাইরে;
হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারালো সে কেমন করে
কেমন করে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপী
বুঝেছি হায় টুপীর লোভে
দেবতাদেরই এ কার্চ্চুপি।

কবি কাদের নওয়াজের কবিতা ভাষা ও ছন্দের মাধুরতায় মহিমান্বিত। সে মাধুরতায় পারস্য কবিদের সুর অনুরনিত হয়েছে যা সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

এই নীতিবাদী সাহিত্যিকের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উৎসাহিত করে শান্তি নিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তাঁর এই সাহিত্যিক জীবনে তিনি পেয়েছেন অভাবিত সম্মান ও ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন পদকে। শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৬৩ সালে পেয়েছেন "বাংলা একাডেমী পুরস্কার" পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তিনি "প্রেসিডেন্ট পুরস্কার" প্রাপ্ত হন। পরবর্তী কালে তিনি "মাদার বক্স" সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় "আমার কবিতা" শিরোনামে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন। এটি-ই কবির সর্বশেষ কবিতা। নিম্নে কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি-

আমার কবিতা নয় সবিতা;
খদ্যোৎ সম দ্যুতি
নয় তরলিত চন্দ্রিকা রাতে
নয় সে শিউলী যুথী।

১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারী সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ছন্দানুসিক কবি কাদের নওয়াজ যশোর সদর হাসপাতালের ১ নং কেবিনে ইন্তেকাল করেন। কবিকে শ্রীপুরে তাঁর গ্রামের বাড়ী মুজদিয়ার পারিবারিক গোরস্থানে পিতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।



নীহার রঞ্জন গুপ্ত

[১৯১১-১৯৮৬ খ্রীঃ]

জনপ্রিয় উপন্যাসিক ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত ১৯১১ সালের ৬ই জুন পিতা সত্যরঞ্জন গুপ্তের কর্মস্থল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস যশোর জেলার (বর্তমান নড়াইল জেলা) নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানার ইত্না গ্রামে।

চাকুরীজীবী পিতার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কালেই গাইবান্দা হাইস্কুলসহ বেশ কয়েকটি স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। অবশেষে ১৯৩০ সালে কোন্নগর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই তিনি আই, এস, সি পাস করে ডাক্তারি পড়ার জন্য কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমানে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ) ভর্তি হন।

ডাক্তারী পাস করে বেশ কিছুদিন নিজস্বভাবে প্রাকটিস করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর ডাক্তার হিসাবে তিনি যুদ্ধে যোগ দান করেন। চাকুরী জীবনের বাধ্যবাধকতা তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হওয়ায় তিনি এ চাকুরী ত্যাগ করে কলকাতায় ব্যক্তিগতভাবে আবার ডাক্তারী শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কলকাতায় বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন।

নীহার রঞ্জন গুপ্তের সাহিত্যে হাতে খড়ি হয়ে ছিল সুদূর শৈশবেই। ষোল বৎসর বয়সেই তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস "রাজকুমারী" ছাপা হয়। ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত পেশায় চিকিৎসক হলেও মানব মানবীর হৃদয়ের



লোহাগড়ার ইতনা গ্রামে ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের বাড়ী

ঘাত-প্রতিঘাত ও মানবিক সুক্ষ্ম দ্বন্দের একজন সুচারু রূপকার। রহস্য উপন্যাস লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কেবলমাত্র রহস্য উপন্যাস নয়, তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য যা- পাঠককুলের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

তাঁর লিখিত উপান্যাসের সংখ্যা দুইশতেরও অধিক। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে, মঙ্গলসূত্র, উর্বশী সন্ধ্যা, উল্কা, বহ্নিশিখা, অজ্ঞাতবাস,

অমৃত পাত্রখানি, ইস্কাবনের টেক্কা, অশান্ত ঘূর্ণি, মধুমতি থেকে ভাগীরথী, কোমল গান্ধার, অহল্যাঘুম, ঝড়, সেই মরুপ্রান্তে, অপারেশন, ধূসর গোধূলী, উত্তর ফাল্গুনী, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, কালোভ্রমর, ছিন্নপাত্র, কালোহাত, ঘুম নেই, পদাবলী কীর্তন, লালু ভুলু, কলঙ্ককথা, হাসপাতাল, কাজললতা, অস্থি ভাগীরথী তীরে, কন্যাকুমারী, সূর্য তপস্যা, মায়ামৃগ, ময়ূর মহল, বাদশা, রাত্রি নিশীথে, কনকপ্রদীপ, মেঘকালো, কাগজের ফুল, নিরালাপ্রহর, রাতের গাড়ী, কন্যাকেশবতী, নীলতারা, নূপুর, নিশিপদ্ম, মধুমিতা, মুখোশ, রাতের রজনী গন্ধা ও কিশোর সাহিত্য সমগ্র উল্লেখযোগ্য।

নীহার রঞ্জনের চল্লিশের অধিক উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এ গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য উল্কা, বহ্নিশিখা, উত্তর ফাল্গুনী, লালুভুলু, হাসপাতাল, মেঘকালো, বাতের রজনীগন্ধা, নিশিপদ্ম, নূপুর, ছিন্নপত্র, বাদশা, কোমল গান্ধার, মায়ামৃগ, কাজললতা, কন্যাকুমারী প্রভৃতি।

তাঁর এই চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাসগুলি আমাদের চলচ্চিত্র জগৎকে সুসমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস লালুভুলু পাঁচটি ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে উপন্যাসটি বাংলাদেশেও চিত্রায়িত হয় এবং দর্শককুলের প্রশংসা অর্জন করে। নীহার রঞ্জনের অনেক উপন্যাস থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস উল্কা দীর্ঘদিন ধরে থিয়েটারের দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে।

চিকিৎসক হিসাবে অতি কর্মচঞ্চল জীবন যাপনের মধ্যেও নীহার রঞ্জন রেখে গেছেন অসংখ্য সাহিত্য ধর্মী সৃষ্টি– যা আপন সত্তায় ভাস্বর। নীহার রঞ্জন গুপ্ত ১৯৮৬ সালের ২০শে জানুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।



ফররুখ আহমদ

[১৯১৮–১৯৭৪ খ্রীঃ]

কবি ফররুখ আহ্‌মদের লেখনী যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি গোলাপী পদ্ম। হাস্নাহেনার মত সুরভিত করেছে জগৎ ও জীবনকে। মুসলিম রেনেসাঁর এই বাঙ্গালী কবি ১৯১৮ সালের ১০ই জুন তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত মাঝআইল গ্রামের বিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ হাতেম আলী এবং বেগম রওশন আখতার ছিলেন ফররুখ আহমদের স্নেহময়ী মাতা। কৈশরেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

প্রাচীন শিক্ষিত পরিবার হিসাবে গ্রামে তাঁদের ব্যাপক সম্মান ও খ্যাতি ছিল। ফররুখ আহমদের দাদা ছিলেন সরকারী চাকরীজীবি, দাদী তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত জমিদার কন্যা। পিতা পুলিশ ইন্‌সপেক্টর।

বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালাতেই ফররুখ আহমদের শিক্ষাজীবনের হাতে খড়ি। পরবর্তীতে কলকাতায় এসে তালতলা মডেল এম, ই স্কুলে ভর্তি হন। এরপর কলকাতার বিখ্যাত বালিগঞ্জ সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন। ঐ সময় কবি গোলাম মোস্তফা বালিগঞ্জ সরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র কবি ফররুখ আহমদের কবিত্ব বিকাশে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই, এ পাস করেন। তিনি কলকাতা স্কটিশ

চার্চ কলেজ ও সিটি কলেজেও পড়াশুনা করেছেন। আই, এ পাস করার পর প্রথমে তিনি দর্শন ও পরে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি, এ তে ভর্তি হন। ইংরাজী সাহিত্যে বেশ কিছু দিন অধ্যয়ন করলেও শেষ পর্যন্ত তাতে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৪২ সালে কবি তাঁর আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়েবা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্য অনুরাগ ও কাব্যপ্রীতি অল্প বয়স কাল থেকেই লক্ষ্যনীয় এবং তাঁর আত্মপ্রকাশ ছাত্র জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রতিটি কাব্যে ফুটে উঠেছে মানব প্রেম ও অকৃত্রিম পল্লীপ্রীতি। ১৯৪৪ সালে কবি বেনজির আহমেদের অর্থানাকূল্যে উনিশটি কবিতার সমন্বয়ে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উনিশটি কবিতার সর্বশেষ কবিতা "সাত সাগরের মাঝি" নামেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি তৎকালীন সময়ের একটি সার্থক রূপক কবিতা। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি লাইন ঃ-

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না ? তবু তুমি জাগলে না ?

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক ! তুমি মিনতি আমার রাখো ঃ

তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতী আবার ভেসেছে সাগরজলে,

নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ–তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু তুমি জাগলে না ?

১৯৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতায় যখন লোক না খেয়ে মারা যেতে লাগলো তখন অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কবি লিখলেন------
" জানি মানুষের নানা মুখ গুজে পড়ে আছে জমিনের পরে
সন্ধ্যার জনতা জানি কোন দিন রাখেনা সে মৃত্যুর খবর''

দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কবি কলকাতায় ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে তিনি আই, জি প্রিজন অফিস ও সিভিল সাপ্লাইতে অল্প সময়ের জন্য চাকুরী করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সাময়িকভাবে মাসিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেন। জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মেও কিছু দিন চাকুরী করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। এখানে তিনি পাকিস্তান রেডিওতে "ষ্টাফ আর্টিষ্ট" হিসাবে যোগদান করেন। পাকিস্তান বেতারে তিনি ছোটদের খেলাঘর অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন নিবন্ধ, কবিতা ও সর্বোপরি অসংখ্য গান, হামদ, নাত, গজল লিখে রেডিওতে পরিবেশন করেছেন। সঙ্গীত বিষয়ে কবি ফররুখ আহমেদের অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁর লিখিত গান গুলির মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয় গান ঃ–

(*) দ্বীন দুনিয়ার সাথী আমার নূরনবী হযরত....
(*) শুনেছি এ বাণী পথে ঊষার,
মান একতা শৃঙ্খলার।
(*) তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদা....................ছাড়া।
(*) চাঁদ ছিল জেগে রাতের মিনারে প্রভাতের কিনারায়।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'মধুর চেয়ে মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা' গানটি বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। শিশুদের জন্যও তিনি অনেক গান রচনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গান ঃ–

ডালে ডালে পাখীর বাসা
মিষ্টি মধুর পাখীর ভাষা
সাত সাগরে নদীর বাসা
কুলুকুলু নদীর ভাষা।
হাজার সুরে হাজার ভাষায়
এ দুনিয়া ঘেরা
আর মাতৃভাষা বাংলা আমার
সকল ভাষার সেরা।

বাংলা সাহিত্যের সার্থক রূপকার কবি ফররুখ আহমদের "হাতেম তায়ী" কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এক অমূল্য সম্পদ। এখানে তিনি কবি মাইকেলকে সম্পূর্ণরূপে অনুস্মরণ করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর লিখনীতে একটি অভিন্ন স্বাতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। 'হাতেম তায়ী' কাব্যটিকে বাংলার অনেক কবি সাহিত্যিকগণ 'মহাকাব্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কবি এখানে পৌরাণিক উপমার আশ্রয় না নিলেও মুসলিম ঐতিহ্যের উপমা সম্ভার ভাষা ও ছন্দের মনোহারিত্বে বর্ণনা করেছেন। এ কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। হাতেমতায়ী কাব্যের কিয়দাংশঃ–

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান–মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো–আলো–অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখী দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে!

কবি ফররুখ আহমদের লেখনী ছিল বিরামহীন, কবির কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনিরা' (১৯৫২), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১ নাট্যকাব্য) 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩) 'হাবেদা মরুর কাহিনী' (১৯৮১) ও 'সিন্দাবাদ' (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। শিশু কিশোরদের ছড়া ও 'কবিতা গ্রন্থ 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫) 'হরফের ছড়া' (১৯৭০) 'ছড়ার আসর' (১৯৭০) 'চিড়িয়াখানা' (১৯৮০) প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর আরো অনেক কাব্য গ্রন্থের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

কবির ছিল কবিতা প্রীতি। কবিতাকে তিনি ভালবাসতেন ছন্দের মহিমায়। গদ্য ছন্দে কবিতা লেখার তিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষ। তাঁর ধারনা কবিতা মানেই মানুষের মনের ছন্দবদ্ধ কথা, ভাবনার কথা। সিন্দাবাদ কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ-

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

কবি ফররুখ আহমদ প্রথম জীবনে প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম, এন, রায়ের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের অধিকারী কবি ফররুখ আহমেদ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মীয় চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এর বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, ধার্মিক, মানবতাবাদী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান কর্মপুরুষ।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর অমর সৃষ্টির জন্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পেয়েছেন অনেক পুরস্কার ও স্বীকৃতি। ১৯৬০ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার "প্রাইড অব পারফরমেন্স" (pride of performance) ও "বাংলা একাডেমী পুরস্কার" লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে 'হাতেমতায়ী' গ্রন্থটির জন্য 'আদমজী পুরস্কার' এবং একই বৎসর তাঁর 'পাখীর বাসা' গ্রন্থটির জন্য 'ইউনেস্কো পুরস্কার' পান।

মরণোত্তর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৮০ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কবিকে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যু এক অভাবনীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। এই অভিমানী কবি চরম দারিদ্রতার মধ্যে চিকিৎসার অভাবে পরম পৌরষত্বের সাথে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে নিয়তি নির্দ্ধারিত মৃত্যুকে বরণ করেছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর প্রতি চরম অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করলেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালী জাতির জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।



সৈয়দ আলী আহসান

[১৯২২ খ্রীঃ–]

আমার পূর্ব–বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকাবের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরেব অতলের মতো
কালো–কেশ মেঘের সঞ্চযেব মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

আমাব পূর্ব–বাংলা বর্ষার অন্ধকাবেব
অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে–যাওয়া
সিক্ত নিলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনক লতায় ঘেরা
কবরী এলো ক'রে আকাশ দেখাব
মুহূর্ত
অশেষ অনুভব নিয়ে
পুলকিত সচ্ছলতা

এই বিখ্যাত কবিতাংশটির কবি সৈয়দ আলী আহসান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা ও শিল্প সচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আলী হামেদ এবং মাতা সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। বরেণ্য তাপস হযরত শাহ আলী বোগদাদীর বংশধর। সৈয়দ আলী আহসানের পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানবান মনিষী ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের শিক্ষা জীবনের সূচনা ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কিন্তু প্রকৃত পাঠচর্চা চলতে থাকে গৃহাঙ্গনে। গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি ফারসী, ইংরাজী, বাংলা ও গণিত শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৩১ সালে ঢাকায় আর্মানিটোলা বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন। এই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৩৭ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর একটি ইংরাজী কবিতা "The rose" প্রথম মুদ্রিত হয়। কবি মতিউল ইসলাম এ কবিতাটি বাঙলায় অনুবাদ করে "চাবুক" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এ সময় "আজাদ" পত্রিকায় তাঁর দু' টি লেখা প্রকাশিত হয়। একটির শিরোনামে "হিন্দু-মুসলিম সমস্যা" এবং অন্যটি "গণতন্ত্র ও ডিকটেটরশীপ।"

১৯৩৯ সালে সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা কলেজে তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই তরুণ বয়সেই তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য তৎকালীন বাংলাভাষার খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। এই সকল কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবুজাফর, শওকত ওসমান, বেগম সুফিয়া কামাল, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪০ সালে সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অধ্যায়নকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং কথা বলার অসাধারণ কলাকৌশলের জন্য সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি "প্রগতি সাহিত্য সংসদ" ও 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪০ থেকে ৪৪ এর মধ্যে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং 'সওগাত' পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। "বুদ্বুদ" 'তারা তিনজন' 'রহিমা' 'জন্মদিনে' গল্পগুলি তাঁর অন্যতম। এ সময় তিনি 'ইহাই স্বাভাবিক' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গল্পচর্চা ছেড়ে শুরু করেন কবিতা চর্চা।

সমালোচক হিসাবে তাঁর পদার্পন ঘটে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হবার পর। এ সময়ে লেখা "রোহিনী" "কবিতার বিষয়বস্তু" ও "কালি কলমের প্রথম বর্ষ" প্রবন্ধ তিনটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

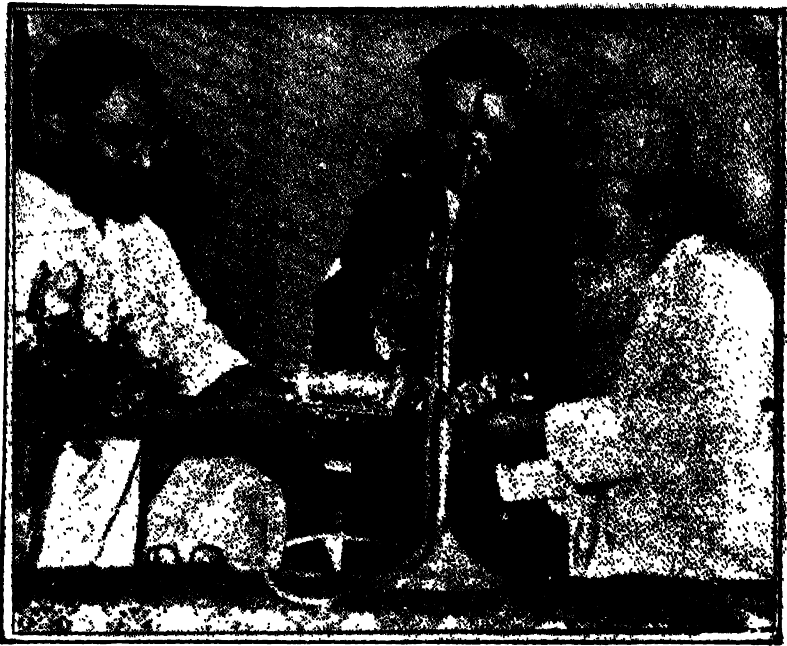
১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী-ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৫ সালে হুগলী ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। এ বছরই তিনি প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন।

১৯৪৬ সালে কমর মুশতরীর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪৭ সালে ঢাকা রেডিওতে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে সাহিত্য কর্মের খ্যাতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন।

১৯৫০ সালে শাহাদৎ হোসেনের কাব্য সংকলন "রূপছন্দা" তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। এ সময় তিনি "ইকবালের কবিতা" সম্পাদনা করেন। ১৯৫৩ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগে "গল্পসঞ্চয়ন" নামে একটি গল্প সংকলন সম্পাদনা করেন। ১৯৫৪ সালে "নজরুল ইসলাম" নামক একটি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ বছর তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক পি, ই, এন, পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে মুহম্মদ আবদুল হাই'এর সহযোগিতায় "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থটি রচনা করেন।



বাংলা একাডেমীতে গুনমুগ্ধজন কতৃক অশীতিবর্ষপূর্তি সংবর্ধনায় ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সৈয়দ আলী আহসানের নিকট থেকে উপহার গ্রহন করছেন ১৯৬২

করাচী থাকাকালীন "কবি মধুসূদন" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

অনুবাদ সাহিত্যে সৈয়দ আলী আহসানের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত উজ্জ্বল। ১৯৬৩ সালে গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের "ইডিপাস" নাটকটি অনুবাদ করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে হুইটম্যানের কবিতা অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। এছাড়াও ইকবালের কবিতা, ইভানগলের কবিতা, মেরডিথের কবিতার অনুবাদ তাঁকে আরও খ্যাতিমান করে তোলে।

সৈয়দ আলী আহসানের প্রতিভা বিভিন্নমুখী। প্রবন্ধলেখা ও সমালোচনায় তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন। "কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা" গ্রন্থে অসাধারণ দক্ষতায় প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে তিনি সৃষ্টিশীল করে তুলেছেন।

তাঁর 'অনেক আকাশ' 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' 'সহসা সচকিত' এবং "আমার প্রতিদিনের শব্দ" কাব্যগ্রন্থগুলো ঐতিহ্যনুরাগী সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতির অনুপম নিদর্শন।

১৯৬৭ সালে সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর "পদ্মাবতী" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ গবেষণা কর্ম। এ বছর তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ কাব্য" "একেই কি বলে সভ্যতা" "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" গ্রন্থ তিনটি সম্পাদনা করেন।

সৈয়দ আলী আহসানের চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং অন্যান্য চারুকলার প্রতি আগ্রহ অপরিসীম। চিত্রকলার ইতিহাস ও চিত্রশিল্পের রসাস্বাদনে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ। চিত্রকলার অধ্যাপনায় তাঁর সাফল্য বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৭০ সালে তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে' প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত বাস্তুহারা বুদ্ধিজীবিদের জীবিকা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালান। এ সময় তিনি ভারতের প্রধান ইন্দিরা গান্ধি, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, সরজিনী নাইডুর সংগে সাক্ষাৎ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্য "মধুমালতি" প্রকাশিত হয়। এই কাব্য গ্রন্থেও তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। ১৯৭৪ সালে 'রবীন্দ্রনাথঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে 'জার্মান সাহিত্য; একটি নিদর্শন' প্রকাশিত হয়।

১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে –

প্রফেসর হিসাবে যোগদেন। ১৯৮২ সালে "Approach" নামে একটি ইংরাজী ষান্মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর 'আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

সৈয়দ আলী আহসান দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও শিল্পের পরিমন্ডলে বিচরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি ফরাসী সরকার তাঁকে একটি সম্মানে ভূষিত করেছেন। অতি উচ্চমানের এই সম্মানটির নাম হলো:

OFFICIRDEL ORDRE DES ARTS ETDES LETTRES. বাংলা সাহিত্যের এই মহান ব্যক্তিত্ব কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকার ধানমন্ডীর কলাবাগানস্থ নিজ বাসভবনে জ্ঞান তপস্যায় নিয়োজিত রয়েছেন।



জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

[১৯২৮ খ্রীঃ-]

দেশের সাহিত্যাঙ্গনের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কবি প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তৎকালীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ (বর্তমানে জেলা) মহকুমার দূর্গাপুর গ্রামে ১৯২৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ফজলুর রহমান সিদ্দিকী ছিলেন মাধ্যমিক সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে বাঁকুড়া জিলা স্কুল, জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল ও যশোর জিলাস্কুলে লেখাপড়া করেন এবং ১৯৪৫ সালে যশোর জিলা স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন।

১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই,এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে বি,এ অনার্স-এ ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে বি, এ অনার্স এবং ১৯৫১ সালে প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পাস করেন। ১৯৫২-৫৪ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উর্সটার কলেজে পড়াশুনা করেন এবং সেখান থেকে বি, এ ও এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৫২ সালে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকাতে প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন।

১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে রীডার ও ১৯৬৪ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৩ সালের জুনমাস পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার পর ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালীন সময়ে তিনি দুইবার (১৯৭৬-১৯৮০,১৯৮১-৮৪ সাল পর্যন্ত) উপাচার্যের দায়িত্বভার পালন করেন। এ ছাড়াও ১৯৯০ সালে তিনি অস্থায়ী রাষ্টপতির উপদেষ্টা পরিষদে 'শিক্ষা উপদেষ্টা'র গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বভার পালন করেন। ১৯৯২ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহন করে বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন।

ছাত্র জীবনেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সাহিত্য প্রতিভার প্রতিফলন ঘটে। এ সময় থেকেই কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এ সময় জার্মান নাট্যকার Eyast Toller এর নাটক (ইংরেজি অনুবাদ The Masses and men) বাংলায় অনুবাদ অংশতঃ 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তিনি মূল লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা ও পিতামহের কাছ থেকে। পরবর্তীতে শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার উৎসাহেই তাঁর লিখনী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন তিনি বাংলা রচনা ও আবৃত্তির জন্য অধ্যাপকদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত একটি কবিতা '' শর্বরী'' (সনেট) সম্ভবত ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মাদীতে ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটি নেপথ্যে সম্পাদনা করতেন তাঁর ফুফাতো ভাই কবি ফররুখ আহম্মদ। তিনি তাঁকে লেখার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ দিতেন। ১৯৫০ সালে দশজন কবির কবিতা নিয়ে আশরাফ সিদ্দিকী ও আব্দুর রশিদ খান' এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নতুন কবিতা' শীর্ষক একটি কাব্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তাঁর পাঁচটি কবিতা স্থান পায়।

এর উল্লেখযোগ্য কবিতা "ভূমধ্যসাগর তীরে'র কিছু অংশঃ-

ভূমধ্যসাগর তীরে ভেঙেপড়া বহু সভ্যতার
কংকাল-ছড়ান পথে স্বপ্নে আমি ঘুরছি অনেক।
ইলাসের প্রান্ত হতে শ্রান্তপায়ে মৌন কর্ডোভার
নির্জন নদীর ধারে সন্ধ্যাবেলা বসেছি ক্ষণিক।
অ্যাথেঞ্চা, সিবিস আর করিন্দের স্তব্ধ রাজপথে
ধূসর ধূলার তলে লেখা আছে যতো ইতিহাস,
যতো জয় পরাজয়, যতো যুদ্ধ, যতো অভিযান-
যখনি বসেছি আমি সিসিলির সমুদ্র সৈকতে,
যখনি লেগেছে মুখে পশ্চিমের অশান্ত বাতাস
জেগেছে আমার মনে সেইসব কাহিনী অম্লান।।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সময়ে ১৯৭১ সালে মিলটনের "অ্যারিও প্যাজিটিকা" এবং ১৯৭৩ সালে মিলটনের "স্যামসন অ্যাগনিসটিজ" এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি অনুবাদ করেন "সেক্সপিয়রের সনেট।" তাঁর অনুদিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যে প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাত্বিক শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে যে সাহিত্য রস সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

কবি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর রচিত কবিতাগুলি ভাষার কারুকার্যে মহিমান্বিত, সাহিত্যরস সমৃদ্ধ এই কবিতাগুলি পাঠক কুলের হৃদয় আকৃষ্ট করে।

১৯৭৫ সালে "হৃদয়ে জনপদে" ১৯৮৪ সালে 'চাঁদ ডুবে গেলে' ১৯৮৮ সালে ''আসন্ন বাস্তিল'' নামে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও ১টি ভ্রমন কাহিনী লিখেছেন। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ জ্ঞানলব্ধ ও ভাষার চাতুর্যে পরিপূর্ণ।

১৯৭৬ সালে "শব্দের সীমানা" ১৯৮৪ সালে "আমার দেশ আমার ভাষা" ১৯৮৬ সালে "পৃথিবী ও পামলোট" (লঘু প্রবন্ধ) ও ১৯৮২ সালে Literature of Bangladesh and other Essays ." ১৯৯১ সালে "বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়" ও ১৯৮৯ সালে "শান্তি নিকেতনে তিন মাস" ভ্রমন কাহিনীটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।



অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বাংলাদেশ রাসায়নিক ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন

তাঁর সম্পাদিত ১৯৭৬ সালে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' (ফররুখ আহম্মদ) ১৯৮৬ সালে "বাংলা প্রবন্ধ পরিচয়" ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা" গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

তিনি ১৯৬১ সালে মুস্তফা নুরুল ইসলামের সঙ্গে যুগ্মভাবে ত্রৈমাসিক 'পূর্বমেঘ' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে চলেছিল দশ বছর। ১৯৮৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে দীপঙ্কর নামে তিনি –

আরেকটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকাটি পাঁচ বছর চলার পর অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত অনিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। এক সময় পূর্বদেশে Bangladesh Times এ প্রতিসপ্তাহে Myself and others সংবাদ এ The Daily Star একতা, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ ও বাংলা বাজার পত্রিকায লিখতেন। The New Nation-এ এখনো লিখছেন।

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমন করে জাতীয ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তিনি।

এই গণতন্ত্রমনা সাহিত্যিক তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য কর্মের জন্য ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন সম্মানে ও পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার। ১৯৭৭ সালে আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৯ সালে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৯০ সালে কাজী মাহাবুবুল্লাহ-বেগম জেবুন্নেছা ট্রাস্ট পুরস্কার লাভ করেন।

বাংলা সাহিত্যের এই খ্যাতিমান কবি প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী আজীবন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়েজিত রেখেছেন।



নিমাই ভট্টাচার্য

[১৯৩১খ্রীঃ-]

জীবনের টানে, জীবিকার গরজে কক্ষচ্যুত উলকার মত এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ-আমেরিকা, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর ঘুরে বেড়িয়েছেন নিমাই ভট্টাচার্য। যারা তাঁকে ভালবেসে কাছে নিয়েছেন, তাঁদের সংগে লেনদেন হয়েছে হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেম ভালবাসার। হঠাৎ করেই একদিন তাদের কথায় লিখতে শুরু করলেন গল্প- উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যের এই খ্যাতিমান উপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য ১৯৩১ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শালিখা থানার অন্তর্গত শর্শুনা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নির্মম অদৃষ্ট সাড়ে তিন বছর বয়সে তাঁকে করল মাতৃহীন। পিতার সীমিত আয়ে অকল্পনীয় দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের মধ্যে ভর্তি হলেন কলকাতা কর্পোরেশন ফ্রি স্কুলে। কলকাতা রিপন স্কুলে কিছুদিন তিনি পড়াশুনা করার পর যশোরে ফিরে আসেন। ১৯৪১ সালে যশোর সম্মিলনী ইনস্‌টিটিউশনে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং নবম শ্রেণী পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বাবুও একসময় সম্মিলনী ইনস্‌টিটিউশনের ছাত্র ও পরবর্তীতে শিক্ষক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর নিমাই ভট্টাচার্য পিতার সংগে কলকাতায় চলে আসেন এবং পুনরায় কলকাতায় রিপন স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং রিপন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ সালে তিনি বি, এ পাস করেন।

দারিদ্রতা নিমাই ভট্টাচার্যকে পরাভূত করতে পারেনি, ক্ষয় করতে পারেনি তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে। পরম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষেছেন তিনি। সাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সেখানেও ভাগ্যের বিড়ম্বনার স্বীকার হন। পুরো এক বছর বেগার খাটার পর মাসিক দশ টাকা ভাতা হয়, তাও আট আনা এক টাকার কিস্তিতে।

নিমাই ভট্টাচার্যের সাহিত্য চিন্তা তাঁর জীবন চর্চার একান্ত অনুগামী হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সাহিত্যে চিন্তার প্রতিফলন। বাংলা সাহিত্যের বড় সঞ্চয় উপন্যাস। উপন্যাসের মাধ্যমেই নিমাই ভট্টাচার্যের সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ। ১৯৬৩ সালে তাঁর লেখা একটি উপন্যাস কলকাতার সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যামোদীদের নিকট ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। পরবর্তীকালে "রাজধানী নৈপথ্য' রিপোর্টার, ভি, আই, পি, এবং পার্লামেন্ট স্ট্রীট নামক চারখানি উপন্যাস ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নিমাই ভট্টাচার্য পুর্ণদ্দোমে লেখা শুরু করেন।

মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, মিনিবাস, মাতাল, ইনকিলাব, ব্যাচেলার, ইমনকল্যান, ডিফেন্স, কলোনী, প্রবেশ নিষেধ, কেরানী, ভায়া ডালহৌসী, হকার্স কর্নার, রাজধানী এক্সপ্রেস, নিমন্ত্রণ, নাচনী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ডার্লিং ম্যাডাম, ওয়ান আপ–টু ডাউন, গোধুলিযা, প্রিয়বরেষু, আকাশ ভরা সূর্য তারা, মোগল সরাই জংশন, ইওর অনার, ককটেল, অনুরোধের আসর, যৌবন নিকুঞ্জে, শেষ পারানির কড়ি, হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স, পথের শেষে প্রভৃতি উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য।

নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা উপন্যাসগুলোতে বিষয়গত বৈচিত্রতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কোন কোন উপন্যাসে তিনি রাজধানীর অন্দর মহলের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা অভিজাত সমাজের কুৎসিত রূপের চিত্র তুলে ধরেছেন। কোথাও নীচু তলার মানুষের সুখ–দুঃখের জীবন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। তাঁর লেখায় কোথাও কোথাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদও লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক উপন্যাসে সোনালী আনন্দ দিনের বিলাপ লক্ষ্যনীয়। তাঁর লিখিত উপন্যাসগুলো সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য।

নিমাই ভট্টাচার্য বাংলা দেশের বগুড়া জেলার কালীতলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা দিপ্তী ভট্টাচার্যকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার টালিগঞ্জের শাশমল রোডের বাসায় বসবাস করছেন। তিনি অবহেলিত লাঞ্চিত মানুষের পরম বন্ধু। তাঁদের ভালবাসাই নিমাই ভট্টাচর্যের লেখনী শক্তি।



মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

[১৯৩৯ খ্রীঃ-]

বাংলা সাহিত্যের নন্দিত গবেষক ও আধুনিক বাংলা কাব্যের শক্তিমান লেখক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৩৯ সালের ৬ই এপ্রিল যশোর শহরের পশ্চিম প্রান্তে খড়কি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ শাহাদৎ আলী।

১৯৫৩ সালে যশোর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাটিকুলেশন পাশ করার পর মনিরুজ্জামান রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৫৫ সালে আই, এস, সি পাস করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেনীতে সম্মান এবং ১৯৫৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেনীতে এম এ পাস করেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পি- এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯-৭০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টারাল গবেষণা করেন।

১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮-৮১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার পালন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন গবেষক পি-এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ, ডি পরীক্ষক।

তাঁর শিক্ষকতা জীবনে তিনি ভ্রাম্যমান অধ্যাপক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, বোষ্টন, আইওয়া, শিকাগো ও বার্কেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রফেশনাল এসোসিয়েট হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬০ সালে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রী রাশিদা জামান ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজের প্রভাষিকা ও কয়েকটি গ্রন্থের লেখিকা।

শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসন সহ দেশ-বিদেশের শিক্ষা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অনেক গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ছাত্র জীবনেই তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় থেকেই ঢাকার খ্যাতনামা পত্রিকাগুলিতে তাঁর লেখা কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লেখা প্রথম কবিতা "এই আজাদী" ১৯৫২ সালে 'ইশারা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা "কৃষ্ণচূড়ার মেঘ"। কবিতাটি রচিত হয় ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৬৮ সালে 'শঙ্কিত আলোক' নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির অংশ বিশেষ ঃ-

এ সব রাত্রিকে ঢেকে দাও
সমুদ্রের বিশাল গহ্বরে, নয়ত উধাও
মেঘ ভরে আনো অবিশ্রাম
বর্ষার সংগীত ।।
এক ঝাঁক নাম
মুখরিত সূর্য কাঁপে
সুদূর বিস্তৃত সেই একক সংলাপে ।।
ইতিহাস তারা নয়
বিস্মৃতি বিলয়
তাদের প্রচ্ছন্ন করে রাখে না কখনো।।

১৯৬১ সালে তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ "দুর্লভ দিন'' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সাহিত্যামোদীদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। ১৯৬৮ সালে 'শঙ্কিত আলোক' "বিপন্ন বিষাদ" নামে দুইটি কাব্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ১৯৭৩ সালে "প্রতন্ প্রত্যাশা" ১৯৭৬ সালে ''ভালবাসার হাতে'' ''ইচ্ছেমতী'' ১৯৮৪ সালে "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার, ''তৃতীয় তরঙ্গে"

১৯৯০ সালে " কোলাহলের পর'' ১৯৯২ সালে ''ধীর প্রবাহে'' ১৯৭৩ সালে অনুবাদ কবিতা এমিলি ডিকিনসনের কবিতা ও ১৯৮৪ সালে ''সঙ্গী বিহঙ্গী'' প্রকাশিত হয়।

কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গবেষণাধর্মী পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ১৯৬২ সালে "আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র," ১৯৬৫ সালে "আধুনিক বাংলা সাহিত্য," ১৯৬৯ সালে "মুহম্মদ শহীদুল্লাহ", ১৯৭০ সালে "আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক", ১৯৭০ সালে "বাংলা কবিতার ছন্দ", ১৯৭৮ সালে "বাঙলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা", ১৯৮১ সালে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস", ১৯৮৫ সালে "আধুনিক বাংলা কবিতা প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত", ১৯৮৪ সালে 'রবীন্দ্র চেতনা', ১৯৯২ সালে "ভাষা আন্দোলনঃ শিক্ষা ও ভাষা পরিকল্পনা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



তাজ মহলের সামনে ডঃ মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ শমশের আলী ও আরো অনেকে

সাহিত্যাঙ্গনে বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদনা করেছেন অনেক গুলি গবেষণা মূলক গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা। যশোরের লোক কাহিনী, প্যারীচাঁদ-রচনাবলী, মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী, নজরুল সমীক্ষণ, ঢাকার লোক কাহিনী, দ্বীজেন্দ্র লাল রায়ের "সাজাহান" নাটক (যুগ্মসম্পাদনা) মুহম্মদ আব্দুল হাই সহযোগে সম্পাদনা "মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ", "সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ" (যৌথ সম্পাদনা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা পত্র "সাহিত্য পত্রিকা" সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তাঁর কবিতা ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, হিন্দী, উর্দ্দু বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

বাংলা সংগীত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ন ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়। তিনি রেডিও টেলিভিশন রেকর্ড ও চলচ্চিত্রের জন্য দেড় সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। তাঁর অসংখ্য দেশাত্ববোধক গানের মধ্যে একটি কালজয়ী দেশাত্ববোধক গানের কয়েক লাইন ঃ-

আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারামন
শ্যামল কোমল পরশ ছড়ায়ে
নেই কিছু প্রয়োজন ।।
প্রাণে প্রাণে যেন তাই
তারই সুর শুধু পাই
দিগন্ত জুড়ে সোনারঙ ছবি
খেলে যায় সারাক্ষণ।।

১৯৬৭ সালে "অনির্বাণ" ও ১৯৮৪ সালে "নির্বাচিত গান" নামে তাঁর দুইটি গীতি কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। 'ডাকবাবু' 'চাওয়াপাওয়া' 'আলীবাবা' 'নতুন নামে ডাকো' ''এতটুকু আশা'' ''পরশমনি'' 'ধীরে বহে মেঘনা'' ছায়াছবিতে তাঁর লিখিত গানগুলি বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে শ্রেষ্ট গীতিকার হিসাবে তিনি জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন

অসাধারণ প্রতিভাধর সাহিত্যিক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশে ও বিদেশে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন সম্মানে।

১৯৭২ সালে কবিতার জন্য তিনি "বাংলা একাডেমী পুরস্কার" লাভ করেন। ১৯৮২ সালে সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য মহাসম্মেলনে মানিকগঞ্জে তাঁকে গুণী সংবর্ধনা দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (কবিতা), লেখিকা সংঘ স্বর্ণপদক (কবিতা), কালুশাহ সাহিত্য পুরস্কার (গবেষণা), হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্নপদক (প্রবন্ধ), ১৯৮৪ সালে চাঁদের হাট পদক (সাহিত্য), ১৯৮৭ সালে একুশে পদক (সাহিত্য), ১৯৮৮ সালে মাইকেল সাহিত্য পুরস্কার (গবেষণা), ১৯৮৯ সালে শিল্পী কামরুল হাসান পদক (সাহিত্য) ও ১৯৯১ সালে সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ স্বর্নপদক (সাহিত্য) এবং ১৯৯২ সালে কবিতায় জসিমউদ্দীন পুরস্কার তাঁকে প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৯ সালে সার্টিফিকেট অব মেরিট ফর ডিস্টিঙ্গুইশড কনট্রিবিউশন টু পোয়েট্রি, ইন্টার ন্যাশনাল হুজ হু ইন পোয়েট্রি, লণ্ডন; ১৯৮২ সালে বিশ্ব সাহিত্যে অবদানের জন্য ডিপ্লোমা ডিমেরিটো ইউনিভার্সিটা ডে লে আর্টি, ইতালি, ১৯৮২ সালে এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন বেতার অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা, কুয়ালালামপুর, প্রথম পুরস্কার (মাটির গানঃ লেখক)। ১৯৮৩ সালে রাদুগা পুরস্কার, মস্কো, (মুক্তিযোদ্ধা ভিত্তিক টেলিভিশন সঙ্গীতালেখ্য 'তোমাদের জন্য' রচনা) ও আন্তজার্তিক রোটারী ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দি রোটারী ফাউণ্ডেশন অব রোটারী ইন্টারন্যাশনাল সাইটেশন ফর মেরিটরিয়াস সার্ভিস' এর সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সমাজ সচেতন এই কবি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবী আদায়ে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণকারী ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এখনও নিরলসভাবে তাঁর সৃজনশীল সৃষ্টির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যে নিরন্তর অবদান অব্যাহত রেখেছেন।

শিল্পী

যশোরের শঙ্কর পরিবার

উদয় শঙ্কর, অমলা শঙ্কর, রবিশঙ্কর হয়ে আনন্দ শঙ্কর–মমতা শঙ্কর পর্যন্ত এক ঝাঁক উজ্জ্বলতম নাম যশোরের গৌরব গাঁথায় রত্নখচিত আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

যদিও উদয় শঙ্কর বা রবিশঙ্করের স্মৃতিতে যশোর হয়তো বহু পূর্বেই বিস্মৃত এবং কখনোই যশোরের মাটির স্পর্শ তাদের শরীর, মন ও মনন. গঠনে কোন অবদান রাখেনি, তবুও শেকড়কে অস্বীকার করা যায়না বলেই যশোরের কৃতী সন্তান হিসেবে তাঁরা অবিস্মরণীয়।

শঙ্কর পরিবারের উত্থান যে উদয় শঙ্করকে ঘিরে তাঁর পৈতৃক বসতভিটা বৃহত্তর যশোরের নড়াইলের কালিয়াতে। আর বৃহত্তর যশোরের মাগুরার মেয়ে অমলা শঙ্কর এ পরিবারে সম্পৃক্ত হন বৈবাহিক সূত্রে। রবিশঙ্কর উদয় শঙ্কর এর অনুজ।



নড়াইলের কালিয়ায় উদয় শঙ্করের বাড়ী



উদয় শঙ্কর

[১৯০০–১৯৭২ খ্রীঃ]

উদয় শঙ্কর প্রাচ্য নৃত্য কলার ক্ষেত্রে একাই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর বিশ্ব বিজয় এবং বিশ্বকে এই উপমহাদেশীয় শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার, বিশেষত নৃত্যকলার প্রতি শ্রদ্ধাবনত করার কর্মমঞ্চটি তাঁর বৈচিত্রময় জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবদান।

এই বিশ্ব নন্দিত নৃত্য শিল্পী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ভারত বর্ষের রাজস্থানের উদয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। উদয়পুরে জন্ম হওয়ায় পিতা শ্রী শ্যাম শঙ্কর চৌধুরী তাঁর নাম রাখলেন উদয়। উদয়ের স্নেহময়ী মাতার নাম হেমাঙ্গিনী।

উদয় শঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা বারানসীতে। পরবর্তীতে বোম্বাইয়ের জেঃ জেঃ স্কুল অব আর্টস এ চিত্র কলা সহ শিল্প সাংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর লণ্ডন রয়্যাল কলেজ অব আর্টস এ চিত্র শিল্পে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ছাত্র যিনি সেখানে "সেন্সর" ও 'জর্জক্লাঝেন' নামে দুটি পদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

নৃত্য শিল্পী হিসেবে উদয় শঙ্করের প্রথম আবির্ভাব ঘটে লণ্ডনে থাকাকালীন ভারতীয় নৃত্য রচনার মাধ্যমে। এ সময় এই নৃত্যগুলি সেখানকার প্রদর্শনীতে মঞ্চায়ন করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। লন্ডনের আইভি হাউসে নৃত্য –

প্রদর্শনের সময় প্রখ্যাত রাশিয়ান ব্যালেরিনা আনাপাভলোভা তাঁর মনোমুগ্ধকর নৃত্য দেখে মোহিত হন।



১৯৩৪ সালে হলিউডের মেট্রো গোল্ডেন স্টুডিওতে উদয় শঙ্করের ট্রুপের ছবি। সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে রবিশঙ্কর উদয় শঙ্কর, সিমকি, হলিউড অভিনেত্রী মেরী কালাইল, কলকলতা, সিরালিজি ও তিমির বরন সহ অনেকে।

আনাপাভলোভা প্রাচ্য নৃত্য কলার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং প্রাচ্য ওরিয়েন্টাল নৃত্য প্রশিক্ষণ দেবার জন্য উদয় শঙ্করকে তাঁর দলে নিয়োগ করেন। তারই অনুরোধে ১৯২৩ সালে উদয় শঙ্কর "রাধাকৃষ্ণ" ও হিন্দু বিবাহ' নামে দুটি ভারতীয় নৃত্য রচনা করেন। এ নৃত্য দুটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় লণ্ডনের কভেন্ট গার্ডেনের রয়েল অপেরা হাউসে। উদয় শঙ্কর 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্যে রাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং পাশ্চাত্য দর্শককূলের হৃদয় জয় করেন।

দীর্ঘদিন পাভলোভার সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নৃত্য প্রদর্শনের পর তিনি স্বতন্ত্রভাবে দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচন্ড প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। বিশেষ করে আনাপাভলোভার উৎসাহ ও অনুপ্রেরনায় তাঁর মনে জন্মে ছিল এক নতুন উদ্যম। সিমকী ছিলেন নৃত্য সঙ্গিনী আর আর্থিক সাহায্য দাতা ছিলেন বিত্তশালিনী চিত্রশিল্পী শ্রীমতি অ্যালিস বোনার।

উদয় শঙ্কর ভারতবর্ষে ফিরে এসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শাস্ত্রীয় ও লোক নৃত্য সংগ্রহ করেন। কেরালার গুরাভায়ুরের একটি মন্দিরে নৃত্য অনুষ্ঠানে 'কথাকলি' নৃত্য দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। এই নৃত্য শেখা এবং একে গভীর ভাবে জানবার জন্য কথাকলি নৃত্য গুরু শঙ্করণ নামবুদ্রীকে শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে উদয় শঙ্কর অ্যালিস বোনারের সহযোগিতায় তাঁর সাংস্কৃতিক দল নিয়ে প্যারিসের পথে যাত্রা করলেন। ভারত বর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের বিদেশ যাত্রার সূচনা।

এই দলের সংগীত পরিচালক ছিলেন তিমির বরন। উদয় শঙ্করের প্রধান নৃত্য সঙ্গীনী ছিলেন সিমকী। আরো অনেকের মধ্যে এই দলে ছিলেন রবি শঙ্কর ও তাদের সহযোগিনী মাতা হেমাঙ্গিনী। উদয় শঙ্কর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন দলকে। নিজস্ব চিন্তা ধারার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন জগদ্বিখ্যাত 'ইন্দ্রনৃত্য', 'গন্ধবনৃত্য' 'সাপুড়েনৃত্য', 'রাধাকৃষ্ণনৃত্য', 'তলোয়ারনৃত্য' এবং ব্যালে হিসাবে 'শিবপার্বতী', 'লেবার এ্যাণ্ড মেশিনারী', 'রিদম অব লাইফ' প্রভৃতি নৃত্য।

১৯৩১ সালের ৩রা মার্চ প্যারিসে এই নৃত্য দলের সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান থেকেই উদয় শঙ্করের জয়যাত্রার শুরু। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি তাঁকে। একের পর এক জয় করেছেন পাশ্চাত্যের মঞ্চগুলো আর তাঁদের হৃদয়।

১৯৩৩ সালে ইউরোপ আমেরিকায় নৃত্য কলা প্রদর্শনী করে জয় মালা গলায় নিয়ে দেশে ফিরলেন উদয় শঙ্কর। কলকাতার টাউন হলে তাঁকে দেওয়া

হলো নাগরিক সংবর্ধনা। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উদয় শঙ্কর আলমোড়ায় পাহাড়ের উপত্যাকা জুড়ে ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ শঙ্কর নামবুদ্রীক, কন্দপ্পন পিল্লেই, অমোবি সিংহ ও আলাউদ্দীন খাঁ-কে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন উদয় শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টার"। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৪৪ সালে এই সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪২ সালে তিনি প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী অমলা নন্দীকে বিবাহ করেন।

সংগীত বিষয়ে উদয় শঙ্কব ছিলেন এক ধরনের পথ প্রদর্শক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বিভিন্ন ধরনেব বাদ্য যন্ত্র।

এগুলির সমন্বয়ে একটা নিজস্ব শব্দ ঝংকার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি বাদ্য যন্ত্রই ছিল ভারতীয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঁশি, সেতার, একতারা, তানপুরা এস্রাজ, সরোদ, খঞ্জনি, ঢোল, ও ড্রাম। তিনি তাঁর দলে কখনোই বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার করেননি।



বৃদ্ধ উদয় শঙ্করের একপাশে রবিশঙ্কর আর এক পাশে কমলা।

তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির একটা দিক হচ্ছে শ্যাডো প্লে। যেখানে তিনি সাদা পর্দার উপর নিজস্ব কৌশলে নতুন আলো ছায়ার ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শিল্পী জীবনের একটা বিরাট স্থান দখল করে আছে 'কল্পনা' চলচ্চিত্র। ছবিটি আর্থিক সাফল্য না পেলেও এটি তাঁর এক কালজয়ী সৃষ্টি।

১৯৬৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'উদয় শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টার'। নতুন উদ্যমে দলকে সুসংগঠিত করে ১৯৬৮ সালে আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন আমেরিকা সফরে। এটিই তাঁর জীবনে শেষ বারের মত আমেরিকা সফর।

১৯৭০ সালে রঞ্জিতমল কাংকারিয়ার সহযোগিতায় প্রযোজনা করেছিলেন "শঙ্করস্কোপ"। ১৯৭২ সালে "শঙ্করস্কোপ" ও "সামান্য ক্ষতি" নৃত্য নাট্যের নবরূপায়নই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কীর্তি।

এই বিশ্ববরেণ্য নৃত্য শিল্পী উদয় শঙ্কর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অভাবনীয় স্বীকৃতি ও সম্মান। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী তাঁকে "দেশিকোত্তম" এবং "ডি, লিট" উপাধি ও ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করেন।

বৃদ্ধ বয়সে আরও কিছু সৃষ্টিধর্মী নৃত্য রচনার বাসনায় টালিগঞ্জের রাধা ফিল্মের ফ্লোর ভাড়া নিয়ে তিনি নৃত্যের মহড়া চালিয়ে যেতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৭২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুর কালছায়া চির দিনের মত তাঁর এ সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দেয়।



অমলা শঙ্কর

[১৯১৮ খ্রীঃ-]

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য শিল্পী ও শিক্ষয়িত্রী অমলা নন্দী ১৯১৮ সালের ২৭শে জুন, তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার বাটাজোড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অক্ষয় কুমার নন্দী।

বাটাজোড় গ্রামের পাঠশালায় দ্বারকানাথ সিকদারের তত্ত্বাবধানে অমলা নন্দীর শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে তিনি খুলনা ও কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাস করেন।

বিশিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসয়ী পিতা অক্ষয় কুমার নন্দীর সঙ্গে প্যারিসে অবস্থান কালেই কলোনিয়াল এগজিবিশনে উদয় শঙ্করের সঙ্গে অমলা নন্দীর প্রথম পরিচয় ঘটে। উদয় শঙ্করের আমন্ত্রণে অমলা নন্দী তাঁর ট্রুপে যোগদান করেন।

উদয় শঙ্করের নির্দেশনায় পরিচালিত নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে ইউরোপের একাধিক মঞ্চে তিনি যশস্বী হয়ে উঠেন।

দীর্ঘ এক বছর ইউরোপ সফর করে অমলা শঙ্কর কলকাতায় ফিরে নৃত্য চর্চায় নিমগ্ন হন। এ সময় তিনি উদয় শঙ্কর ও কথাকলির নৃত্য গুরু শঙ্করণ নামবুদ্রির কাছে নৃত্যের তালিম নিতে থাকেন। পরবর্তীতে আলমোড়ায় ইণ্ডিয়ান কালচার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে অমলা শঙ্কর এখানে এসে যোগদেন। এখানে তাঁর নৃত্য চর্চার সাথে সাথে চলতে থাকে চিত্র কলার চর্চা।



উদয়শঙ্কর, স্ত্রী অমলা শঙ্কর ও পুত্র আনন্দ শঙ্কর।

এভাবে ব্যাপক উদ্দীপনার সংগে শিক্ষা সমাপ্ত করে অমলা শঙ্কর স্বামী উদয় শঙ্করের সংগে তাঁর নৃত্য দলের প্রধান নৃত্য শিল্পী হিসেবে বেরিয়ে পড়লেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। সেই সময়কার অনুষ্ঠান গুলোতে তাঁর অসাধারণ নৃত্য কলাকৌশল যে সৌন্দর্যময় স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতো তা দর্শককূলের হৃদয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে।

নৃত্য শিল্পী অমলা শঙ্করের আর একটি বিশেষ শিল্পী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর অংকিত চিত্রকলার মাধ্যমে। বিশেষ করে কলকাতা ইডেন গার্ডেনের উন্মুক্ত মঞ্চে উদয় শঙ্করের 'লর্ডবুদ্ধ" রঙ্গিন ছায়ানৃত্যে তাঁর

আংকিত সুন্দর সুন্দর স্লাইডগুলো দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল এবং পরবর্তীতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " সামান্য ক্ষতি" নৃত্য নাট্যেও তাঁর আঁকা স্লাইড গুলোও ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

শ্রীমতি অমলা শঙ্কর তাঁর এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন প্রচুর সম্মান ও ভূষিত হয়েছেন একাধিক পুরস্কারে। ১৯৯১ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে ভারতেব অন্যতম উচ্চ সম্মান "পদ্মভূষণ" লাভ করেন। দিল্লীতে এক রাষ্ট্রীয় আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন।

অমলা শঙ্করের একমাত্র পুত্র আনন্দ শঙ্কর সংগীত জগতে এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তার সেতারের সুর বিশ্বনন্দিত। তিনি বেশ কয়েকটি ছায়াছবিতে সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা করেছেন। ১৯৭৪ সালে প্রখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেনের 'কোরাস' ছবিতে সুরারোপের জন্য তিনি পেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কার। তাঁর স্ত্রী তনুশ্রী শঙ্করও একজন নামকরা নৃত্য শিল্পী ও অভিনেত্রী।

শ্রীমতি অমলা শঙ্করের একমাত্র কন্যা মমতা শঙ্করও নামকরা অভিনেত্রী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য শিল্পী। মমতা শঙ্কর সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন সহ অনেকে খ্যাতিমান পবিচালকের পরিচালিত ছায়াছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে যশের অধিকারিনী হয়েছেন।

এই খ্যাতমান নৃত্য শিল্পী অমলা শঙ্কর সমগ্র জীবন নৃত্য সাধনা করে বর্তমানে "উদয় শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টার'-এ নৃত্য পরিচালনার মাধ্যমে নৃত্যকলার প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।



রবিশঙ্কর

[১৯২০ খ্রী–]

'রবিশঙ্কর' একটি নাম। যে নামটি ইন্দ্রজালের মত মোহিত করে রেখেছে বিশ্বের সুরের জগতকে। রবিশঙ্কর নামের সঙ্গে অঙ্গিভূত হয়ে আছে সেতারের সুর।

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ট ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ রবিশঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল উত্তর ভারতের কাশীতে।

১৯৩০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে দাদা উদয় শঙ্করের ট্রুপে নৃত্য শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সেখানে নৃত্য প্রদর্শন করেন।

অল্প বয়স থেকেই সেতারের স্পর্শে আসেন তিনি। নিজ প্রচেষ্টায় এবং প্রতিভাবলে সেতারে বিভিন্ন সুর অনুকরণ করে বাজাতেন। এ ভাবেই এক ভুঁই ফোঁড় ওস্তাদ হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে এলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন. খাঁর নিকট।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রবিশঙ্কর মাইহারে বাবা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর ঘরানায় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুর সাধনা করে জয় করেছেন সুরের জগতকে।

১৯৪১ সালে রবিশঙ্কর একুশ বৎসর বয়সে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে আলমোড়ায় প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের কিছুদিন পর তাঁর পুত্র শুভ–র জন্ম হয়।

তাঁদের বিবাহের সুখের দিন দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। ১৯৮৯ সালে তিনি দ্বিতীয় বারের মত বিবাহ করেন তাঁর এক সময়ের ভক্ত ও ছাত্রী সুকন্যা রাজনকে।

শিক্ষাকালীন সময়ে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর অনুমতিতে রেডিওতে দু চারটে প্রোগ্রাম ও বিভিন্ন জলসায় কিছু কিছু অনুষ্ঠান করতে শুরু করেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে কলকাতার বৌ বাজারে এক ঘরোয়া জলসায় কলকাতায় তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর এক পাশে রবি শঙ্কর এবং আলী আকবর। অন্য পাশে নীতি আশিস খাঁ এবং তবলা শিল্পী হীরু গাঙ্গুলী।

১৯৪৪ এর শেষের দিকে রবিশঙ্কর বোম্বে বসবাস শুরু করেন। এ সময় বোম্বের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিসকভারি ও ইন্ডিয়া ব্যালের নির্দেশনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি।

দীর্ঘদিন রবিশঙ্কর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মিউজিক ডিরেকটর এর দায়িত্ব ভার পালন করেন। এ সময়কালে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগেও তাঁর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। শিল্পীদের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর ছিল প্রবল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

১৯৫৬ সাল থেকে আজ অবধি ভারতীয় শাস্ত্র সংগীতের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্ডিত রবিশঙ্কর প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন, সিডনী ও শিকাগোসহ পৃথিবীর প্রায় বড় বড় শহর গুলোতে সুরের আগুন ছড়িয়ে জয় করে চলেছেন লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকূলের অন্তর।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশ্ববিখ্যাত বেহালা বাদক ইহুদী মেনুহীনের জন্য কয়েকটা রাগাশ্রয়ী রচনা করেছিলেন। যার কতকগুলি ইউরোপের নামকরা অনুষ্ঠানগুলোতে তারা যৌথভাবে পরিবেশন করে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে ছিলেন।

রবিশঙ্কর ও মেনুহিনের যৌথ প্রথম রেকর্ড "ওয়েস্টে মিট্স ইস্ট" এর প্রথম ভল্যুমটা গ্র্যামি পুরস্কার লাভ করে। এ পুরস্কারটি অস্কার পুরস্কারের সমতুল্য। এর পরে তাদের আরো কয়েকটি ভল্যুম বের হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের দিকে তিনি 'সুপারস্টারডম' পেয়ে গেলেন। বিশ্বব্যাপী তার আরো খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এছাড়াও তিনি দেশ বিদেশে পেয়েছেন দুর্লভ সম্মান ও ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কারে।



ইন্দিরা গান্ধীর সংগে রবিশঙ্কর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মারিয়ান অ্যানডারসন

তাঁর অমর সৃষ্টি বেশ কয়েকটি রাগ তাঁকে কালজয়ী করে রেখেছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষ স্মরনীয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' সহ অসংখ্য ছায়াছবিতে তিনি সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন।

১৯৭০ সালে তাঁর পিতৃভূমি বাংলাদেশ প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাসের করাল গ্রাসে পতিত হলে, তিনি তাঁর ছাত্র বীটল জরজ হ্যারিসনের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে "বেনিফিট কনসার্ট" এর আয়োজন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর্থিক সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বিশ্ববিখ্যাত পঁচাত্তর জন শিল্পীর সমন্বয়ে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

এই মানব প্রেমিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সেতু বন্ধনকারী শিল্পী রবিশঙ্কর সেতারের সুরেব ঝংকারে বিশ্ববাসীকে আরো কিছু সৃষ্টি ধর্মী সুর উপহার দেওয়ার সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন।



ধীরাজ ভট্টাচার্য

[১৯০৫–১৯৫৯ খ্রীঃ]

বাংলা চলচ্চিত্রের অজস্র অনুরাগীর অন্তরলোকে যার ভাবমূর্তি চিরলাবণ্য ও মহিমায় বিরাজমান তিনি হলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে তিনি তাঁর অসামান্য শৈল্পিক প্রতিভায় লক্ষ নরনারীর হৃদয়রাজ্যে হয়ে উঠেছিলেন এক রূপ কথার খলনায়ক।

ধীরাজ ভট্টাচার্য ভূমিষ্ট হয়েছিলেন ১৯০৫ সালে যশোর জেলার কেশবপুর থানার পাঁজিয়া গ্রামে। পিতা ললিতমোহন ভট্টাচার্য ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন। নিজ গ্রামের পাঁজিয়া স্কুলে ধীরাজ ভট্টাচার্যের শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। পরে তিনি কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। আশুতোষ কলেজে আই, এস, সি পড়াকালীন সময়ে সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট হন। সুদর্শন চেহারা, ঘন কোকড়ানো চুল, ইষৎ ট্যারা হলেও চোখের চাউনিতে মাদকতা। চিত্র পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়ের পছন্দ হয়ে যায় ধীরাজ বাবুকে। তাঁর সহায়তায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডান কোম্পানীর নির্বাক ছবি 'সতী লক্ষী' তে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান।

সিনেমায় অভিনয় করায় বাড়ীতে অশান্তি; আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অসন্তোষ। তাই সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ধীরাজের বাবা ধীরাজকে পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে (আই, বি) ভর্তি করে দেন। প্রথম পোষ্টিং কলকাতায়।

কলকাতার এই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে চট্টগ্রামে পুলিশ অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সেখান থেকে বার্মায়। পুলিশের চাকুরিতে নানা বিপর্যয়ের কারণে তিনি চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন।

কলকাতায় ফিরে পুনরায় সিনেমা জগতে প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রপরিচালক মধু বাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। মধু বাবু তখন তাঁর ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন। মধু বাবু আবিস্কার করলেন ধীরাজকে। বিখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালক নরেশ মিত্র ও ধীরাজ বাবু যশোর জেলার লোক। নরেশ বাবু ধীরাজকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি অভিনয়ের ব্যাপারে যতটুকু পেরেছেন তালিম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। যে সমস্ত নির্বাক ছবিতে অভিনয় করে ধীরাজ বাবু তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন সেগুলি 'সতীলক্ষ্মী', 'গিরিবালা' 'বাসবদত্ত, 'কালপরিণয়' 'মৃণালিনী' এবং রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে 'নৌকাডুবি'। শেষোক্ত ছবিটির পরিচালক নরেশ মিত্র।



বাসবদত্তা ছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য ও কানন বালা

সবাক যুগে ধীরাজ বাবুর প্রথম ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এরপর থেকেই ধীরাজবাবু একের পর এক অভিনয় করে চললেন। পৌরাণিক ধর্মমূলক ছবিতে। 'যমুনা পুলিন' 'চাঁদ সদাগার', 'দক্ষযজ্ঞ', 'রাজনটি', 'বসন্তসেনা', 'বাসব দত্তা', 'নরনারায়ন', 'কৃষ্ণসুদামা' ইত্যাদি। কষ্টিউম ছবিতে অভিনয় করতে করতে ধীরাজ বাবু বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর ওই কেষ্টঠাকুর মার্কা চেহারা দেখে প্রযোজকরা অন্যধরনের ছবিতে তাঁর কথা ভাবতে চাইলেন না। ওই ধরনের এক ঘেয়ে ভূমিকায় তাকে দেখতে দেখতে দর্শকদের মনেও ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, তাঁর বোধ হয় অন্য কোন ধরণের অভিনয় করার যোগ্যতা নেই। দর্শকদের ভাষায় তখন তিনি "রাঙ্গা মূলো"।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ধীরাজ বাবু বিবাহ করলেন চব্বিশ পরগনার গোপালপুর নিবাসী বিনোদ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতি স্বরসতী চৌধুরীকে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ধীরাজ বাবু 'কণ্ঠহার' ছবিতে কাননদেবীর বিপরীতে ভিন্নধর্মী একটা ভূমিকা পেলেন। কিছুটা ভিলেন টাইপের রোল, অভিনয় ভালই করলেন। কিন্তু কষ্টিউম ড্রামার হাত থেকে সম্পূর্ন মুক্তি পেলেন না। 'জোয়ার ভাটা' নামে চার রিলের একটা ছোট ছবিও পরিচালনা করলেন। কিন্ত ছবিটি তেমন জমল না। তবে একটা কাজ হল। পর পর সামাজিক ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন। অধিকাংশই মেরুদণ্ডহীন নায়কের ভূমিকা। যার কাজ কেবলমাত্র প্রেম করে যাওয়া। 'ব্যবধান' নামক একটা ছবিতে প্রতিমা দাস গুপ্তার বিপরীতে প্রেমের খেলায় রিতিমত সেক্স টেক্সের প্রয়োগ করলেন। কিন্তু 'রাঙ্গামূলো' বিশেষণের শাপ মুক্তি তাতেও ঘটলনা। ফলে ধীরাজ বাবুর বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করেছে তখনও তাঁকে বিশ বছরের তরুণী নায়িকার বিপরীতে গাছের ডাল ধরে প্রেমের গান গেয়ে বেড়াতে হয়েছে। ওই সময় সাহিত্যিক পরিচালক শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' 'মানে না মানা' ইত্যাদি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। ধীরাজ বাবু বলেছিলেন "শৈলজা" তোর পায়ে পড়ি একটু অন্য ধরনের রোল আমায় দে। "এই বয়সে আমি আর প্রেম, প্রেম খেলা খেলতে পারছিনা।

শৈলজানন্দ হেসে বলেছিলেন "পাগল নাকি: তুমি হচ্ছ নায়ক, মহানায়ক, সিনেমার রাজ্যে তুমি নায়ক হয়ে জন্মেছো, নায়ক হয়েই তোমাকে মরতে হবে"।

ধীরাজবাবুর শাপমুক্তি ঘটিয়েছিলেন আর এক সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নতুন ঘর' ছবিতে তিনি ধীরাজবাবুকে একটি টাইপ রোল দিয়েছিলেন যশুরে ভাষার সংলাপে এই চরিত্রটিতে ধীরাজ বাবু মাতিয়ে দিলেন।



বেদুইন ছায়াছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্যের সংগে রেনুকা রায়

আর তাঁর পরের বছরই ''কালো ছায়া'' ছবিতে ভিলেন রোলে একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল ধীরাজ বাবুর সামনে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরেশ মিত্রের 'কঙ্কাল' ছবির পর ধীরাজ বাবু বাংলা সিনেমার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ খলনায়ক হিসাবে একের পর এক ভিলেন চরিত্র করে যেতে লাগলেন। ধীরাজ বাবুর সেই সময়কার ছবি গুলোর নাম শুনলেই বোঝা যাবে কি ভয়াল ভয়ঙ্কর রোল তাঁকে করতে হত। "মরণের পরে", "হানাবাড়ী, 'ডাকিনীর চর'' "রাত একটা" "ধুমকেতু"–এই সব ছিল ধীরাজ বাবুর অভিনীত তখনকার ছবির নাম। শেষ জীবনে আবার ব্যাডম্যানের ইমেজ কাটিয়ে গুডম্যান হয়ে গিয়েছিলেন ধীরাজ বাবু। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে হাজারি ঠাকুরের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করার পর তাঁর এই রুপান্তর ঘটে।

ধীরাজ বাবুর ছিল এক আশ্চর্যরকম শিল্প চেতনা বোধ। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্যজিত রায়ের "পথের পাঁচালী" দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। এর প্রতি দৃশ্য যেমন 'ব্যাঙ মরে ঢোল হয়ে জলের উপর পড়ে থাকা ; জলের উপর পোকামাকড়ের খেলা; গ্রামের পথ; কাঁশবন; অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া রেলের লাইন; এর সব কিছুই তাঁর শিল্পী মনকে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল।

ধীরাজ বাবু ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক উজ্জল নক্ষত্র। তিনি বিভিন্ন ছায়াছবিতে অভিনয় করে হাজার হাজার দর্শকের মন জয় করেছেন। তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্য অঙ্গনেও ধীরাজ বাবুর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। পঞ্চাশের দশকে লেখক হিসাবে তার আবির্ভাব। দেশ' পত্রিকার পাতায় যখন পুলিশ ছিলাম''যখন নায়ক ছিলাম'– গ্রন্থ দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থ দুটি পাঠক সমাজে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর লিখিত অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মন নিয়ে খেলা' 'সাজানো বাগান' 'মহুয়া মিলন' উল্লেখযোগ্য।

এই কালজয়ী চিত্র অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চুয়ান্ন বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন একরাশ স্মৃতি রেখে।



কমল দাশগুপ্ত

[১৯১২-১৯৭৪ খ্রীঃ]

উপমহাদেশের সংগীত সূর্য কমল দাশগুপ্ত যশোরেরেই কৃতী সন্তান। কমল দাশগুপ্তের পৈত্রিক নিবাস তৎকালীন যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার (বর্তমান জেলা) কালিয়া থানার বেন্দাগ্রামে। ব্যবসাজীবী পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের কুচবিহারে অবস্থানকালে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই কমল দাশগুপ্তের জন্ম হয়।

পিতামহ কামিনীরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গীত অনুরাগ পরিবারের অন্যদের মধ্যেও ছিল। পিতা তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্তও ভাল ধ্রুপদী গাইতেন। কমল দাশগুপ্তের ভাইবোনেরা সকলেই কণ্ঠশিল্পী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশেই কমল দ।শগুপ্তের সংগীত শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কমল দাশগুপ্ত ক্যালকাটা একাডেমী থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি, কম পাস করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কমল দাশগুপ্ত কে "Doctorate of Music" ডিগ্রী প্রদান করেন, 'মীরার ভজন' এর সুরারোপের জন্য।

কমল দাশগুপ্তের আনুষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার সূচনা হয় নিজগৃহে, দাদা বিমল দাশগুপ্তের কাছে। এরপর শ্রী রামকৃষ্ণ মিশ্র ও দিলীপ কুমার রায়ের কাছে কিছুদিন গানের তালিম নেন। এ সময় তিনি দিলীপকুমার রায়ের সংগীত দলের সদস্য হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন। অন্ধ গায়ক শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র কাছে তিনি কয়েক বৎসর

সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। ঠুংরীরাজ ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের তিনি ছিলেন প্রিয় পাত্র। ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কমল দাশগুপ্তকে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম দিয়েছিলেন। কমল দাশগুপ্তের বাড়ীতে নিয়মিত সংগীতের আসর বসতো। এই সকল আসরে উপস্থিত থাকতেন তখনকার বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে কমল দাশের বড়ভাই বিমল দাশগুপ্ত, শ্রী তুলসী লাহিড়ী, শ্রী সচীনদেব বর্মন, কবি শৈলেন রায়, ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও শিশুশিল্পী কমল দাশগুপ্ত।

ত্রিশের দশকের পূর্বে মনোমুগ্ধকর বাংলা গানের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। এ সময় রবীন্দ্র সংগীত সবেমাত্র বেতার ও গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। কাজী নজরুল ইসলামের গান শৈশব কাটিয়ে তখনও ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি।

বাংলা গানের এ প্রান্তে কয়েকজন প্রতিভাশালী সংগীতজ্ঞের আবির্ভাব বাংলা গানের জগৎকে সমৃদ্ধশালী ও জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁদের মধ্যে দিলীপ কুমার রায়, রায়চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সুর সাগর হিমাংশুদত্ত, শচীনদেব বর্মন ও গীতিকার সুরকার অনিল ভট্টাচার্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কমল দাশগুপ্তের বড় ভাই বিমল দাশগুপ্ত এ সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর একজন ট্রেনার ছিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে কমল প্রায়ই গ্রামোফোন কোম্পানীতে যেতেন। ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে গ্রামোফোন কোম্পানীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সমাধা করে দিতেন। বিশেষ করে নতুন নতুন সুরারোপ ও রেকর্ডিং এর কাজ গুলি। এ ভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩২ সালে নিজের সুরারোপিত গানের রেকর্ড করার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম সুরারোপিত গানের গায়ক ছিলেন সত্যবর্তী। গান দুটির প্রথম লাইনঃ

(১) গানের মালা গেঁথে গেঁথে–

(২) কতকাল আছি চেয়ে চেয়ে–

এর কিছুদিন পর তাঁর স্বকণ্ঠে দুটি বাংলা গজল রেকর্ড করা হয়। গজল দুটির প্রথম লাইন ঃ–

(১) কোন স্বপ্ন লেগেছে আমার–

(২) কত জ্বালা সব বলনা–

কমল দাশগুপ্ত যখন কলকাতা বেতার ও হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের তরুণ শিল্পী; তখন আধুনিক বাংলা গানের দৈন্যদশা তাঁর শিল্পীমনকে ব্যথিত করে তোলে। এই সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সৃষ্টি করেন এক নতুন সুরের ধারা। যেখানে তিনি একেবারে স্বতন্ত্র।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মিলিয়ে চার হাজারের অধিক গানের সুরারোপ করেছেন এবং অসংখ্য গানে কণ্ঠও দিয়েছেন। বাংলা এবং হিন্দি গানের সব ভুবনেই বিচরণ করেছেন তিনি। উর্দু ভাষার উপরও তাঁর ছিল বিশেষ পারদর্শিতা। শ্রীমতি যুথিকা রায় ও কমল দাশের দ্বৈত উর্দ্দুতে গাওয়া না'ত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। হিন্দীতেও তিনি গীত ও ভজন রচনা করেছেন প্রচুর। ঠুংরী সৃষ্টিতেও তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সুরের জগতে রাগরাগিনীর উপর অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর।

দক্ষিণভারতের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতি শুভলক্ষীর কণ্ঠে কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত বিখ্যাত "মৈ নিরগুনিয়া গুন নেহী" ভজনটি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তাঁর সুরারোপিত হিন্দিগান "ও প্রীত নেভানেওয়ালী" এবং "কিত্‌নে দুখ্ ভুলায়া তুমনে" গান দু'টি শ্রোতাদের মনে আশ্চর্য রকম প্রভাব বিস্তার করে। "যদি ফিরে দেখা হয় সহসা" ঠুংরী সৃষ্টি তাঁর একটি কালজয়ী সৃষ্টি। "চুপকে চুপকে বোল ময়না" সুরারোপিত গানটির রেকর্ডের লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হয়েছিল। এভাবেই তাঁর সুরারোপিত বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ভাষার গানগুলি অনাদিকাল ধরে সংগীত পিপাসুদের হৃদয় আঁকড়ে থাকবে।

বাংলা সংগীত কাননে চিরবিরাজমান সুরসম্রাট কমল দাশগুপ্ত আপন প্রতিভাবলে সুরের মহিমায় ফুটিয়েছেন অসংখ্য পুষ্পরাজি। কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত গানগুলি মোহিত করেছে জগত ও জীবনকে। তাঁর সুরের এমন কিছু গান, যা সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের মনে ভাবের সঞ্চার করে ঃ-

গানের প্রথম লাইন	গীতিকার	শিল্পী
পৃথিবী আমারে চায় রেখনা বেঁধে আমায়	মোহিনী চৌধুরী	সত্য চৌধুরী
মুখে কেন নাহি বলো		সত্য চৌধুরী

গানের প্রথম লাইন	গীতিকার	শিল্পী
তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন	প্রনব রায়	জগন্ময় মিত্র
আমি বন ফুল গো	প্রনব রায়	কানন দেবী
ভুলি নাই নয়নে তোমায়	মোহিনী চৌধুরী	জগন্ময় মিত্র
ফেলে যাবে চলে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কানন দেবী
ভাল না লাগে তো দিও না মন	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কানন দেবী
লাগুক দোলা		কানন দেবী
ও প্রীতি নেভানো ওয়ালী		হেমন্ত মুখোপধ্যায়
যদি গান থেমে যায় দীপ নিভে যায়		সত্য চৌধুরী
এই কি গো শেষ দান	প্রনব রায়	রবীন মজুমদার
দুটিপাখি দুটি তীরে	গিরীণ চক্রবর্তী	তালাতমামুদ
জেগে আছি এক, জেগে আছি কারাগারে–	মোহিনী চৌধুরী	জগন্ময় মিত্র
আমি দূরন্ত বৈশাখী ঝড়		জগন্ময় মিত্র
কিত্‌নে দুখ ভুলায়া তুমনে		হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
জানি জানি গো মোর শূন্য হৃদয় দেবে ভরে	সুবোধপুরোকায়স্থ	জগন্ময় মিত্র
এনেছি আমার শত জনমের প্রেম		
মেনেছিগো হার মেনেছি		
আমার এ ভালবাসা জানিগো তোমার	সুবোধপুরকায়স্থ	
শোন গো সোনার মেয়ে		তালাতমামুদ
যাদের জীবন ভরা শুধু আখিজল		
স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর		
মৈ নিরগুনিয়া গুন নাহী		শ্রীমতি শুভলক্ষী
ওরে আমার গান		
কদম কদম বাহারায়ে যা		
ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে তোমারে করেছে রাণী	মোহিনী চৌধুরী	জগন্ময় মিত্র
হারা মরুনদী	প্রেমেন্দ্র মিএ	কানন দেবী

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর রণসংগীত " কদম কদম বার হায়ে যা" সঙ্গীতটির সুরকার কমল দাশগুপ্ত। এর সুরে মোহিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর গোল্ডেন জুবিলীর বিশেষ গানটি কমল দাশকে দিয়েই সুরারোপ করে রেকর্ড করিয়েছিলেন।

কমল দাশগুপ্তের শিল্পী জীবনের সোনালী অধ্যায় জুড়ে রয়েছে রূপালী পর্দা। তিনি ছায়াছবির অসংখ্য গানে সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছায়াছবির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি, তামিল, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার ছবিতে সংগীত পরিচালনা ও সুরারোপ করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

নিম্নে তাঁর সুরারোপিত ও সংগীত পরিচালিত ভারতীয় ছায়াছবি গুলির আংশিক তালিকা ঃ-

পণ্ডিত মশাই, গরমিল, শেষ উত্তর, জবাব, যোগাযোগ, হসপিটাল, চন্দ্রশেখর, নববিধান, ভাবীকাল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বিদেশিনী, প্রার্থনা, মন্দির, বঞ্চিতা, রাঙ্গামাটি, গিরিবালা, মেঘদূত, মধুমালতি, গোবিন্দদা, বধুবরণ, প্যাহেচান, ইবান কি একরাত ও এ্যারাবিয়ান নাইটস। "কেন এমন হয়" নামে বাংলাদেশের একটি ছায়া ছবিতে তিনি সংগীত পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে কমল দাশগুপ্ত বৃটিশ ডানকান ব্রাদার্সের কিছু তথ্যমূলক চিত্রে সংগীত পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। শেষ উত্তর, যোগাযোগ, চন্দ্রশেখর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কৃতিত্বের জন্য তাঁকে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সুরস্রষ্টা কমল দাশগুপ্তের জীবনে কবি নজরুল ইসলাম এক সুদীর্ঘ অধ্যায়। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব তিনি নজরুল সংগীতের বিশেষজ্ঞ ও সুরকার। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এগারটি বৎসর হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসে কবির সঙ্গে কাজ করেছেন। কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস অফিসে।

কমল দাশ দিনরাত কবির সঙ্গে কাটিয়ে নজরুল সঙ্গীত তথা বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। বিদ্রোহী কবি তাঁর বিশেষ গানগুলি তাঁকে সুরারোপের জন্য দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। কমল দাশের অনুরোধে কবি নজরুল ইসলাম উর্দু গজল ও কাওয়ালীর সুরে অনেক গান রচনা করেছেন। এমনকি কবি তাঁর জন্য বেশ কিছু ইসলামিক গানও লিখেছিলেন।

এ সময় কমল দাশকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম ও ওস্তাদ জমির উদ্দীনখাঁর সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা ও বিভিন্ন সুরারোপের কাজে নিয়োজিত থাকতে হতো। এই ব্যস্ততম সময়ে অধিকাংশ দিনই কবি নজরুল ইসলাম ও কমল দাশগুপ্ত দিনের বেলায় খাওয়ার সময়টুকুও পেতেন না। কবির একান্ত সঙ্গী হিসাবে কবির শিল্পী মনের বিচিত্র পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। তাই কবির রচিত প্রেম, ঋতু, ইসলামী, ভজন, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি চারশতের অধিক বিরল গানের সুরারোপ করার মত দূর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত।

কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ রকম কিছু বিখ্যাত গান ঃ-

গানের প্রথম লাইন	শিল্পী
আগুন জ্বালাতে আসিনি গো	সত্য চৌধুরী
আধখানা চাঁদ জাগিছে আকাশে	জগন্ময় মিত্র
গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়	জগন্ময় মিত্র
আধো আধো বোল	কমল দাশগুপ্ত
জাগ অমৃত পিয়াসী চিত্ত মোর	কমল দাশগুপ্ত
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি	কমল দাশগুপ্ত
তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর	কমল দাশগুপ্ত
তোমার হাসিতে জাগে	কমল দাশগুপ্ত
প্রভঞ্জন বীণা তব বাজে	কমল দাশগুপ্ত
বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে	কমল দাশগুপ্ত
ভালো লাগার স্মৃতি ভোলা	কমল দাশগুপ্ত
এস আনন্দিতা ত্রিলোক	কমল দাশগুপ্ত
চম্পা পারুল যুঁথি	কমল দাশগুপ্ত
প্রিয়তম এস ফিরে	কমল দাশগুপ্ত
বইল যখন প্রেমের হাওয়া	কমল দাশগুপ্ত
শঙ্কাশুন্য লক্ষ কণ্ঠে	কমল দাশগুপ্ত

গানের প্রথম লাইন	শিল্পী
পরম পুরুষ স্নিগ্ধ যোগী	কমল ও যূঁথিকা
প্রিয় আসিল রে	কমল ও যূঁথিকা
আমার ভূবন কান পেতে রয়	যূঁথিকা রায়
ভীরু এ মনের কলি	যূঁথিকা রায়
কেমনে রাঁধার কাঁদিয়া বরষ যায়	যূঁথিকা রায়
কেঁদোনা কেঁদোনা মা গো	যূঁথিকা রায়
বনের তাপস কুমারী আমি গো	যূঁথিকা রায়
বল প্রিয়তম বলো	যূঁথিকা রায়
মনে পড়ে আজ সে কোন	যূঁথিকা রায়
মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী	যূঁথিকা রায়
আমি যদি আরব হতাম	সকিনা বেগম
আমি যার নূপুরেব ছন্দ	ইলা ঘোষ
কেন মনোবনে মালতী বল্লরী	ইলা ঘোষ
এ কোন মধুর শরাব দিলে	আব্বাস উদ্দিন
এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল	আব্বাস উদ্দিন
নীল আসমানের কোরান	আব্বাস উদ্দিন
খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী	আব্বাস উদ্দিন
খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে	আব্বাস উদ্দিন
মোহম্মদ মোর নয়ন মণি	আব্বাস উদ্দিন
ভাবতের দুই নয়ন তারা	আব্বাস/মৃণাল
এস প্রিয় মন রাঙায়ে	পারুল সোম
ও কে সোনার চাঁদ	আব্দুল লতিফ
আমিনা দুলাল এস	আব্দুল লতিফ
কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা	সুধীরা দাশগুপ্ত
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা	কে, মল্লিক
চুরি করে এন গিরি	কে, মল্লিক

গানের প্রথম লাইন	শিল্পী
তুই অমন করে আর হাসিসনে	কে, মল্লিক
তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা	কে, মল্লিক
বর্ষা গেল আশ্বিন এল	কে, মল্লিক
মোর না মিটিতে আশা	শান্তা আপ্তে
প্রজাপতি, প্রজাপতি	অসিতা বসু
বাঁশীতে সুর শুনিয়ে	হরিমতি
হে প্রিয় নবী রসুল আমার	রওশন আরা বেগম
দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই	মোহাম্মদ কাসেম



কমল দাশগুপ্ত ও স্ত্রী ফিরোজা বেগম

এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। অর্থের প্রতি কোন মোহই ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দুঃখীজনের বন্ধু। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষ যখন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত তখন কলকাতায় ভূখা নাঙ্গা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন

কমল দাশগুপ্ত। নিজ খরচে লঙ্গর খানা খুলে প্রতি দিন একশত করে লোক খাওয়াতেন তিনি। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা প্রায় মাস ব্যাপি অব্যাহত ছিল।

১৯৫৬ সালে ফরিদপুর জেলার খান বাহাদুর ইসমাইল হোসেনের কন্যা উপমহাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের সঙ্গে কমল দাশগুপ্তের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এই মহতি শিল্পী সমগ্র জীবন ব্যাপি নজরুল সংগীত পরিবেশন ও গবেষণা করে তাঁর শিক্ষাগুরু কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্বামী কমল দাশগুপ্তের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ দেশের সন্তান কমল দাশগুপ্ত এক বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৬৭ সালে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর সে প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সংগীতের সীমিত জগৎ ও পরিবেশ তাঁর শিল্পী মনকে ব্যথিত করে তোলে। আহত হৃদয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এদেশের সংগীত জগৎকে; কিন্তু তদানীন্তন সরকারের সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকদের অবমূল্যায়ন ও অবহেলায় সঙ্গীত জগৎ –এর কোন অঙ্গনেই সামান্যতম স্থানটুকুও হয়নি তাঁর জন্য।

নিদারুণ হতাশা ও দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়েই এ সময়কার (ঢাকার) দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে কমল দাশগুপ্তের। জীবিকার অন্বেষণে অর্থের প্রয়োজনে ঢাকার হাতির পুলে "পথিকার" নামে একটি ছোট ষ্টেশনারী দোকান খুলেছিলেন তিনি।

জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর কিছুদিনপূর্বে কমল দাশগুপ্তকে বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপসন সার্ভিসের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মৃত্যুপথযাত্রী কমল দাশগুপ্ত রেডিওতে এই স্বল্পকালীন অবস্থান কালেই আব্দুল গাফফার খান চৌধুরী রচিত একুশের জনপ্রিয় সঙ্গীত " আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী" গানটির স্বরলিপি প্রনয়ন করেন। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু হামদ, নাত, বাংলা কাওয়ালী সহ

কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান "শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্নিবায়" ও "পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা" গান দুটির সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের স্টুডিও রেকর্ডও প্রনয়ণ করেন।

এই মহতী শিল্পীর অবদান ও তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

সঙ্গীত জগতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত। কিন্তু অনাদরে অবহেলায় এই প্রতিভাধর কর্ম পুরুষের জীবন মৃত্যু ঘটে মৃত্যুর বহু পূর্বেই, চির মৃত্যু হয় ১৯৭৪ সালের ২০শে জুলাই ঢাকার পি,জি হাসপাতালে। ঢাকার আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।



মোস্তফা আজিজ

[১৯২৩ খ্রীঃ–]

পেন্সিল স্কেচের ক্লান্তিহীন শিল্পী মোস্তফা আজিজ নিজেকে তিনি " **Jack of all trades, master of none!"** বলেই দাবি করেন। তাস, পাশা, দাবা, ক্যারাম থেকে শুরু করে হকী, ক্রীকেট, ফুটবল, জুডো, কুস্তি, ঘুষোঘুষির কোনটাই তিনি বাদ দেন নাই। তাই তো শিল্পী মোস্তফা আজিজ উল্লেখিত সকল স্তরের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দেরই ছবি এঁকেছেন শুধুমাত্র দু'টি পেন্সিলের মাধ্যমে একটি কালো অপরটি ব্রাউন।

পল্টন ময়দানে বক্তৃতামঞ্চ থেকে দৃঢ়কণ্ঠে নির্যাতীত শোষিত মানুষের হয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানাচ্ছেন একজন জননেতা, কর্তব্য ব্যস্ততার মধ্যে একজন সাংবাদিকের চেতনা কিভাবে ফুটে উঠ্ছে, আপন ভূবনে সৃষ্টির নেশায় একজন কবি–সাহিত্যিক কিভাবে মগ্ন আছেন, সুরের মুর্ছনায় আপন মনে গাইছেন একজন বাউল, দুর্ভিক্ষ–প্রপীড়িত কোন একজন আদম সন্তান, বিভিন্ন মিলের কুলি–মজুর, কারখানার শ্রমিক, মাঠের কৃষিজীবী, মিউনিসিপ্যালিটির ডোম, মেথর, এছাড়া পথে প্রান্তরের নির্যাতীত বুভুক্ষুদের স্কেচ বা অভিব্যক্তিও বাদ পড়েনি শিল্পী আজিজের "পেন্সিল স্কেচে"। তিনি ছবি আঁকেন শুধু মানুষের। তাও পুরো শরীরখানা নয়– শুধুমাত্র মুখের অভিব্যক্তি।

"মানুষের মন মূহর্তে মূহর্তে বদলায়", সেই বদলানো অভিব্যক্তিটি আজকালের একমাত্র ভি–ডি–ও ক্যামেরা দিয়েই দেখানো সম্ভবপর কিন্তু সেই অভিব্যক্তিটি অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়।

এই দুঃসাধ্য কাজটি কেবলমাত্র পেন্সিলের স্বল্প আঁচড়ে এবং রবারের ঘসা-মাজা ব্যতীরেকে ক্ষণিকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পী মোস্তফা আজিজ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যালামিটি বা দুর্যোগপূর্ণ ঘূর্ণীঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত এলাকার ছবি আঁকা এবং যে কোন দুর্ঘটনায় আহত নিহতের ছবিও এই শিল্পীই আঁকেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উল্লেখিত যাবতীয় অভিব্যক্তিকে ভিত্তি করে শিল্পী মোস্তফা আজিজ প্রতিবেদনও লেখেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।



মোস্তফা আজিজের পেন্সিলস্কেচে ঢাকা, মহম্মদপুরের শতবর্ষের এক বৃদ্ধা

এই খ্যাতনামা শিল্পী মোস্তফা আজিজের জন্ম ১৯২৩ সালের ১লা এপ্রিল ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার সন্নিকটে মনোহরপুর গ্রামে। পিতা বরেন্য কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা। শিল্পী আজিজ কবির দ্বিতীয় পুত্র। আর তৃতীয় পুত্র শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। দুই ভাই- দুই শিল্পী।

ছেলেবেলায় শৈলকুপা প্রাইমারী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই শিল্পী মোস্তফা আজিজের ছবি আঁকার "হাতে খড়ি"। পরবর্তীতে কলকাতা বালীগঞ্জ গর্ভণমেন্ট হাই স্কুলে ৫ম শ্রেণী হতে ছবি আঁকার উদ্দীপনা বাড়তে থাকে, তাঁর বড়ভাই ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ার ও মায়ের অনুপ্রেরণায়। উক্ত বালীগঞ্জ সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার পিতা কবি গোলাম মোস্তফা ও তাঁর আর্ট-টিচার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে তাঁর শিল্পী জীবনের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

১৯৪৩ সালে কলকাতার বালীগঞ্জ এ.টি, মিত্র হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে এক বছর পড়ার পরই তিনি কলকাতা কলেজ অব্ আর্টস এণ্ড ক্র্যাফট্স এ ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে ছয় বছরের পরিবর্তে দশ বছরে সেখান থেকে "কমার্শিয়াল আর্টস "এ ডিপ্লোমা নিয়ে পাস করে বেরোলেন শিল্পী মোস্তফা আজিজ।

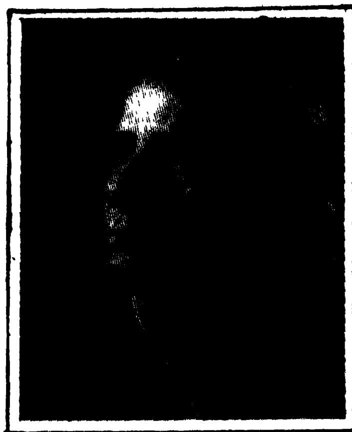
পরবর্তীতে তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসে ঢাকার নওয়াব গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা আরমানিটোলা পাইলট স্কুল ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি তেজগাঁও জুট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটেও কিছুদিন আর্টিষ্ট কাম-ফটোগ্রাফার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এর পর তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে চারু ও কারু শিল্পের প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। পরে মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং পরিশেষে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে অধ্যাপনার পর ১লা এপ্রিল, ১৯৮০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬১ সালে শিল্পী মোস্তফা আজিজ সাফায়েতুন-নবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা নিঃসন্তান।

শিল্পী মোস্তফা আজিজ দীর্ঘদিন ইলাষ্ট্রেশন, ও কভার ডিজাইনের পর আঁকা শুরু করলেন, "ফাইন-আর্ট" অর্থাৎ "মানুষের প্রতিকৃতি"। এই ছবি আঁকার পরিপ্রেক্ষিতে মওলানারা শিল্পীকে কাফের ফতুয়া দিলেন, গরীবের ছবি আঁকাতে পুলিশে কমিউনিষ্ট্ অ্যাখ্যা দিয়ে ধর-পাকড় শুরু করলো। আর সাধারণ লোক স্কেচের মর্ম না বুঝে নানান ঝামেলায় ফেলতে লাগল।

শিল্পী মোস্তফা আজিজ এ যাবৎ আট হাজারেরও অধিক শুধু মানুষের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। কুড়ি বারেরও অধিক শিল্পী মোস্তফা আজিজের একক চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে। এই খ্যাতিমান শিল্পীর অতি মূল্যবান বেশ কিছু " পেন্সিল স্কেচ্" জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্যে সরকার লক্ষাধিক টাকায় ক্রয় করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

শিল্পীর বয়স বর্তমানে ৭০ বৎসব। এখনও তিনি পর্যটকের মত স্কেচখাতা, কন্টি ও সেলুলয়েড় পেন্সিল ও স্কেচিং-টুলখানা নিয়ে পথ চলতে চলতে, মানুষের চেহারা দেখ্তে দেখ্তে হেঁটে যান। কেউ জোর-জবরদস্তি করে চাপ সৃষ্টি করলেও তিনি ছবি আঁকেন না। কিন্তু তাঁর মনের মত মানুষ পেলে সেই মূহুর্তেই ছবি আঁকতে শুরু করেন।



এস, এম, সুলতান

[১৯২৩ খ্রীঃ–]

চিত্রা নদীতে বাঁধ দিয়েছে,
হারিয়ে গেছে সোত
নেই মধ্যরাতের কুলকুল ধ্বনি
নেই খেয়া তরীর আনাগোনা।
দূর–দুরন্ত থেকে আসেনা ভেসে
মাঝি মল্লার ভাটিয়ালী জারী সারি।

লাল মিয়ার জন্মভূমি, যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার (বর্তমান জেলা) মাছিমদিয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত চিত্রানদীকে কেন্দ্র করেই, লাল মিয়ার আক্ষেপ। যৌবনে তিনি দেখেছিলেন চিত্রার যৌবন। আজ তাঁর উপর হয়েছে বাধ, চিত্রার যৌবনে পড়েছে ভাটা, নদীর কুলকুল ধ্বনি হারিয়ে গেছে মাঝি-মাল্লার জারি–সারি গান আজ আর নেই। নিষ্প্রাণ নিশ্চুপ চিত্রা, আজ স্রোত হারা গতি হারা।

চিত্রার মতোই লাল মিয়ার যৌবনে পড়ছে ভাটা। বার্ধক্যের এই প্রান্তে এসে লাল মিয়া বার বার স্মরণ করেছেন তাঁর শৈশব ও কৈশরের চিত্রা নদীকে। ইউরোপ–এশিয়ার বহুদেশ ঘুরে ফিরে এসেছেন জন্মভূমি চিত্রার তীরে।

আজ থেকে সত্তর বছর আগের কথা। ১৯২৩ সালের আগষ্ট মাসে মাছিমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন লালমিয়া। তাঁর পিতা মেসের মোল্লা ছিলেন নড়াইল জমিদার বাড়ির রাজমিস্ত্রী।

শিশুকালেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। শিশু লালমিয়ার শিক্ষারাম্ভ হয় ১৯২৮ সালে নড়াইল কলেজিয়েট স্কুলে। শিশুকাল থেকেই পিতার সাথে লালমিয়া প্রায়ই জমিদার বাড়িতে যেতেন। জমিদার বাড়ির কারুকার্য খচিত বিরাট দালান, সুউচ্চ মিনার, নকশা করা চুড়ামনি, সিংহ দরজায় অংকিত নানান চিত্র, পশু পাখীর মূর্তি, বিরাটকায় স্তম্ভের উপর সিংহের মূর্তি; লতাপাতার আঁকাবাঁকা প্রতিচ্ছবি। এ সবের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন লাল মিয়া। ভাবতেন এগুলোর ভিতর তাঁর পিতার আঁকা ছবিও আছে। মনের অজান্তে মাটির উপর আঁচড় টেনে টেনে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন তিনি। শিশু শিল্পীর কচি হাতের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে বিস্মিত হতেন জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্কুলের ড্রইং শিক্ষক কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য।

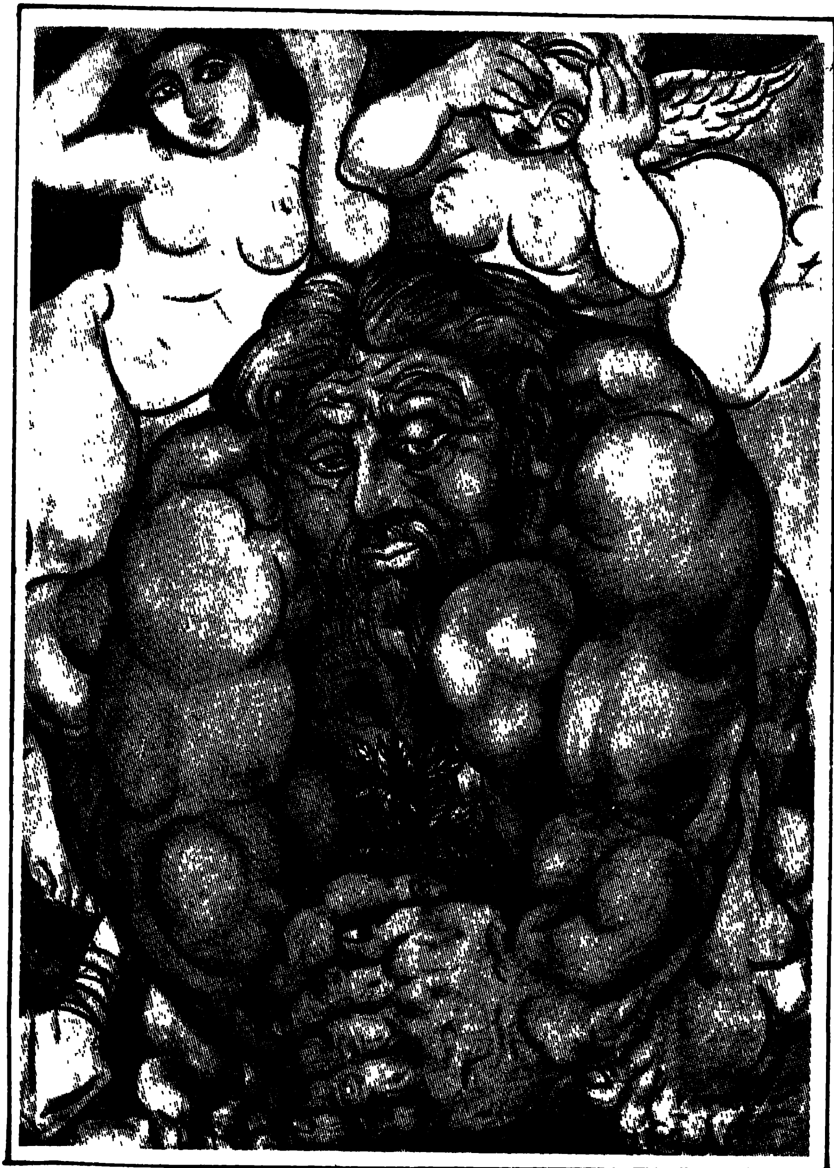
ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের ভ্রাতুস্পুত্র অরুন রায় তখন কলকাতা আর্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি লালকে গরু ও বক আঁকতে বললেন। আঁকা দেখে অরুন রায় বুঝেছিলেন এই শিশু শিল্পীর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা। ১৯৩৩ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালীন তাঁর স্কুলে আসেন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী। তিনি তাঁর একটি ছবি এঁকে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

শিল্পী হবার প্রবল মনোবাসনায় ১৯৩৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বালক লালমিয়া গ্রামের মায়া ত্যাগ করে পাড়ী জমালেন কলকাতায়। কলকাতায় কাশিপুরে জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ এর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এখানে তাঁর বেশ ভাল লেগে গেল। অরুন রায়ের সাথে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকা, মেথর পাড়ায় গিয়ে নাচ দেখা, আর শশ্মান ঘাটের কীর্তন শুনে কেটে যেত সারাদিন।

কলকাতায় কিছুদিন ভবঘুরে জীবন যাপন করার পর আর্টস কলেজে ভর্তি হবার উম্মাদনায় মেতে উঠলেন লালমিয়া। অরুনরায়ের সহযোগীতায় ভর্তি পরীক্ষা দিলেন। পনেরো মিনিটে নির্ভূল ভাবে আঁকলেন ভেনাস ডি, মিলের ছবি। তাঁর আঁকা ছবি প্রশংসিত হলো। ফলাফলের মন্তব্যে অধ্যক্ষ মুকুল দেব লিখলেন পাস এন্ড ফাস্ট। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদান করলেও; সমস্যা দেখা দিল শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে। এন্ট্রান্স পাস সার্টিফিকেট না থাকায় ভর্তির সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট হবার উপক্রম হল। সমস্যাটি সমাধান করে দিলেন জমিদার ধীরেন রায়। তিনি তাঁকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট পাঠালেন। তিনি ছিলেন এই কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য। তাঁর সহযোগিতায় লালমিয়া ভর্তির অনুমতি পেলেন এবং সোহরাওয়ার্দীর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। সাহেদ সোহবাওয়ার্দী তাঁর নতুন নাম রাখলেন সেখ মুহম্মদ সুলতান অর্থাৎ এস, এম, সুলতান।

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা সরকারী আর্ট ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়) চিত্রকলার শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় কলকাতায় "নৃত্যকলা স্কুলে" সাধন বোসের কাছে নৃত্যচর্চাও করতেন। কলকাতার এই সোনালী দিন গুলোতে যে সকল বরেন্য ব্যক্তি বর্গের সহচার্য্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, যামিনী রায়, আবু সাঈদ চৌধুরী, উদয় শংকর, ওস্তাদ বাড়ে গোলাম আলী, জয়নাল আবেদীন ও কামরুল হাসানের স্মৃতি তাঁর মানসপটে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

বৈচিত্রময়ী শিল্পী সুলতান আর্ট কলেজের মোহ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন আগ্রা, সিমলা, মিশৌরী, কাশ্মীর, নতুন জীবনের অন্বেষনে। ১৯৪৬ সালে নতুন জীবনের সন্ধান পেলেন সুলতান। ভারতের শিমলায় প্রদর্শিত হলো তাঁর একক চিত্র। এই প্রদর্শনীই তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম স্বীকৃতি। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের লাহোর এবং করাচীতে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মাছিমদিয়ার পোড়াভিটায় ছুটে আসেন সুলতান। এখানে পিতা নেই; মাতা শৈশব কালেই চলে গেছেন। সৎমার সংসারে কিছুদিন থেকেই সুলতান আবার ছুটলেন নতুন দিগন্তের সন্ধানে।



এস, এম, সুলতানের অংকিত তেল রঙচিত্রে প্রথম বৃক্ষ রোপন।

পাকিস্তানে যেয়ে পরিচয় হলো ফিরোজ খাননুন ও ফাতেমা জিন্নাহর সাথে। সোহরাওয়ার্দী ডেকে পাঠালেন সুলতানকে। ইনসটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশান এ সিলেক্ট হয়েছেন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থ আনুকুল্যে করাচী থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তিনি। বহু দেশ ঘুরে ফিরে দেখলেন শিল্পকলা সম্পর্কে বক্তৃতাও করলেন বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আঞ্চলিক মিলনায়তনে। নিউ ইয়ার্ক; ওযাই এম সি এ, ওয়াশিংটন ডি. সি; বোষ্টন; শিকাগো ইন্টারন্যাশনাল হাউস; মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রভৃতিস্থানে তাঁর চিত্র প্রদর্শিত হয়। লণ্ডনের হ্যামস্টীডে ভিক্টোরিযা এমব্যাংকমেন্ট এ পিকাসো, দালী, ব্রাক, ক্লী এবং অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন তিনি।

১৯৫৩ সালে ইউরোপ থেকে দেশের মাটিতে ফিরে এলেন সুলতান। শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদীনের আমন্ত্রনে কিছুদিন অবস্থান করলেন সেগুন বাগিচায়, ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্রাবাসে। এ সময় তাব বেশভূষা ছিল বাঙ্গালী মেয়ের মত। শাড়ী পবতেন, পায়ে নুপুর পরে নাচতেন, বাঁশিও বাজাতেন ভাল, ছবিও আঁকতেন প্রচুর। ওযাটাব কালার স্কেচ, গ্রাম বাংলার ছবি, গ্রামের মানুষের ছবি, নৌকার মাঝিব দাড় বেযে যাওয়া ছবি। তাঁব ছবিেত Landscape -এর উপর জোর দেখা যায়। একটি বিশেষত্ব নিয়ে ছবি এঁকেছেন সারা জীবন। যা দেখে বোঝা যায এস, এম, সুলতানের ছবি। ছবি বিক্রি হতো প্রচুর কিন্তু তাঁর কোন হিসেব ছিল না। সব ছড়িয়ে ছিটিযে থাকলো একদিন সুলতান এখান থেকে চলে গেলেন নড়াইলে। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে সুলতান নড়াইলে এসে জমিদারদের ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে শিশুদের একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। ছেলেমেয়েরা আসতে শুরু করলো। লেখাপড়ার সাথে সাথে ছবি আঁকা শেখান হতো। কিন্তু ভগ্নপ্রায় জমিদার বাড়ীর শেষ অংশটুকু নিধনের কাজ তখন এগিয়ে চলেছে। বাধ্য হয়ে স্কুলটা বন্ধ করে দিতে হলো। মাছিমদিয়ায় তাঁর পৈত্রিক নিবাস অন্যের দখলে। চাচুড়ি পুরুলিয়ায় মামার বাড়ীতে চলে এলেন সুলতান।

এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে পুরুলিয়া গ্রামে কৈলাশ ঠাকুরের জঙ্গলাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত প্রাচীন বাড়ীটি তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়। এই সর্প আশ্রিত ভূতুড়ে পাকা বাড়িটিকে কিছু উৎসাহিত লোকের সাহায্যে সংস্কার সাধন করেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন "নন্দন কানন দি স্কুল অব ফাইন আর্টস" এবং এর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের পাঠক্রম। পরবর্তিতে এখানে একটি হাইস্কুল ও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

নড়াইলের চাচুড়ী পুরুলিযা থেকে যশোরে চলে এসে চাঁচড়া রাজবাড়ীতে "ইনটেলেকচার কলোনী" নামে একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক আহমদ আলী খাঁন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এগার খানের নমশুদ্রদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বাঁকড়ী গ্রামের সন্ধ্যাকালীন আসরের তিনি ছিলেন গোসাই। গোসাইকে নিয়ে নাচগান হত। তিনি নিজেও নাচতেন। বাঁশি বাজাতেন মধুর সুরে। ১৯৬৯ প্রতিষ্ঠা করলেন "নড়াইল কুড়িগ্রাম ফাইন আর্টস ইনসটিটিউশন" ঢাকার সোনার গায়েও তিনি একটি আর্টস স্কুল খুলেছিলেন।

যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালযের অধ্যক্ষ মরহুম আব্দুল হাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে "The Accadamy of Fine Arts" নামে একটি চিত্রকলার স্কুল খোলেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক, কবি আজিজুল হক এর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৭৩ সালে তিনি "চারুপীঠ নামে যশোরে একটি "চারুকলা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে এবং ১৯৭৮ সালে জার্মান কালচারাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় ঢাকাতে তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে তাঁর অসংখ্য চিত্র প্রদর্শনী হয়।

তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি ১৯৮২ সালে "একুশে পাদক" ১৯৮৬ সালে "বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ" সম্মান ও ১৯৯৩ সালে "স্বাধীনতা পদক" লাভ করেন।



এস. এম, সুলতানের প্রমোদ তরী শিশু স্বর্গের নিকটে এস. এম, সুলতান।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রেসিডেন্ট আর্টস হিসাবে বিশেষ সম্মান এবং সর্বপবি Cambridge University তাঁকে Man of Achievment উপাধীতে ভূষিত করেন এবং তাঁর বায়োগ্রাফী লেখা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্টপতি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভায় মোহিত হয়ে রাষ্টীয় খরচে তাঁকে একটি সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করে দেন উপঢৌকন হিসেবে, যে বাড়িটি তিনি শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে যেতে চান। সেখানে তিনি গড়ে তুলেছেন এক আনন্দ জগৎ। গাছ-গাছালী, লতাপাতা, ফুলে-ফলে ভরা সমগ্র ভূবন। বিভিন্ন ধরণের পশুপক্ষী এই চিরকুমার শিল্পীর নিত্যদিনের সঙ্গী। আর তাঁর চির আপন জন শিশুদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন, শিল্পকলার স্কুল, "শিশুস্বর্গ"।



বনানী চৌধুরী

[১৯২৪ খ্রীঃ-]

তখনকার দিনে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে রূপালী পর্দার বুকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েদের অংশ গ্রহণ ছিল একেবারে অকল্পনীয়। এই গোড়ামী পরিবৃত্ত সমাজের কু-সংস্কারকে উপেক্ষা করে রূপালী পর্দায় একটি নতুন মুখ সংযুক্ত হল। যাঁর আসল নাম বেগম আনোযারা নাহার চৌধুরী লিলি। পোষাকী নাম বনানী চৌধুরী।

পুলিশ কর্মকর্তা পিতা আফসার উদ্দীন আহমদ এর কর্মস্থল বনগাঁতে অবস্থান কালেই ১৯২৪ সালের মে মাসে বনানী চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী বৃহত্তর যশোর জেলার (বর্তমান মাগুরা জেলা) শ্রীপুর থানার সোনাতনদি গ্রামে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী গ্রামের স্কুলেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৩৬ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়েই এ, রাজ্জাক চৌধুরীব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি কলকাতা ওয়াক্ফ-এর কমিশনার ছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত স্বামী রাজ্জাক চৌধুরীর উৎসাহেই বনানী চৌধুরীর শিক্ষা জীবন বিকশিত হয়। ১৯৪১ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে আই, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর শৈল্পিক প্রতিভার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এ সময় বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোতে তাঁর অংশ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতো। বিদ্যালয়ের মঞ্চস্থ থিয়েটার গুলোতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ ও কবিতা আবৃত্তি করে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন তিনি।

শৈশব কাল থেকেই চলচ্চিত্রের প্রতি এক দূর্লভ আকর্ষণ ছিল তাঁর। এই আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে স্বামী ও বন্ধু প্রতিম কথাশিল্পী মানিক বন্দোপাধ্যায় এবং সুলতান আহমদের উৎসাহ ও সহযোগীতায়।

চিত্র পরিচালক গুনময় বন্দোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এই অনবদ্য অভিনেত্রীকে ১৯৪৬ সালে সর্ব প্রথম 'বিশ বছর আগে' ছবিতে দেখা যায়। এই লাবন্যময়ী চিত্র তারকা এই ছবিতে এত নিখুঁত ও নৈপূন্যতার সঙ্গে অভিনয় করলেন যে, চিত্রামোদীদের হৃদয় রাজ্যে স্থান করে নেন।



অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী।

এরপর বিভিন্ন ছবির জন্য ডাক আসতে থাকে বনানী চৌধুরীর। 'তপোভঙ্গ, চলার পথে, অভিযোগ, নন্দরামের সংসার, পূর্বরাগ, 'পরশ পাথর' মহাসম্পদ, শেষের কবিতা, মায়াজাল, বিশের ধোঁয়া, শোন বরনারী, আম্রপালী, ঝাঁসী কি রাণী, তাপসী, প্রভৃতি ছবিতে একের পর এক অভিনয় করে জন প্রিয় হয়ে উঠেন।

বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পথহারা, শাপমোচন, নিয়তি ও স্বাক্ষর ছবিতে বৈচিত্র পূর্ণ অভিনয় করে চলচ্চিত্র জগতে নিজের এক ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন তিনি।

১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় তিনি জহির রায়হান পরিচালিত 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবিতে অভিনয় করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের আরো কয়েকটি ছবিতেও তিনি অভিনয় করেন।

১৯৪৬ সাল থেকে তিনি অদ্যাবধি বিভিন্ন ছায়াছবিতে যে সমস্ত খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল ও মলিনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতির বসু , আর হেমেন গুপ্ত ও জহির রায়হানের মত পরিচালকের নির্দেশনায় অভিনয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনি।

চলচ্চিত্রে অভিনয় ছাড়াও বনানী চৌধুরী কলকাতার মঞ্চ ও বেতারের সংগে সংযুক্ত ছিলেন।

দুই সুসন্তানের জননী বনানী চৌধুরী বর্তমানে চলচ্চিত্র জগত থেকে অব্যাহতি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কলকাতার ১নং পার্ক স্ট্রীট, পার্ক সার্কস এর বাসায় সুখী সংসার জীবন যাপন করছেন।



মুস্তাফা মনোয়ার

[১৯৩৫ খ্রীঃ-]

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উজ্জ্বল মধ্যমনি মুস্তাফা মনোযার। তাঁর বিভিন্ন মুখী শিল্পকর্ম তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌছে দিয়েছে।

এই বরেন্য শিল্পী ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যশোর জেলার মাগুরা (বর্তমান জেলা) মহকুমার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত নাকোল গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কবি গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ। মুস্তাফা মনোয়ারের পৈত্রিক নিবাস যশোর জেলার ঝিনাইদহ (বর্তমান জেলা) মহকুমার শৈলকুপা থানার মনোহরপুর গ্রামে। কবি পরিবারে জন্ম হওয়ায় পারিবারিক জীবন ছায়ায় বসে শিশু কালেই শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, শিশু বয়সেই নরম হাতের ছোয়ায় সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন তিনি। প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর নানা ধরণের কার্টুন ছবি। গানের প্রতি ছিল তার সহজাত আকর্ষণ। কণ্ঠেও ছিল সুরের মধুরতা।

মুস্তাফা মনোয়ার যখন নারায়নগঞ্জ সরকারী হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার এঁকে নারায়নগঞ্জবাসীকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এর পুরস্কার স্বরূপ তিনি পেয়েছিলেন পাকিস্তান সরকারের জেল যন্ত্রনা।

১৯৫৩ সালে তিনি নারায়নগঞ্জ সরকারী হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন।

কলেজে অধ্যায়নকালে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার সুরেলা কণ্ঠের জন্য খ্যাতিমান গায়ক হিসাবে সবার নিকট বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে এই সময়ে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পল্লীগীতি গেয়ে তিনি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি বিখ্যাত পল্লীগীতি শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর সংগীত দলের শিল্পী হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। পল্লীগীতি ছাড়াও তাঁর কণ্ঠে গীত ও গজলের অপূর্ব মাধুর্য ছিল। তিনি হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের এক সংগীত প্রতিযোগিতায় শিল্পী মহেন্দ্র কাপুর ও সুধীর সেনের সঙ্গে মেট্রোতে গান গাইবার আমন্ত্রণ লাভ করেন।



ছবিতে মুস্তাফা মনোয়ার ও তার সৃষ্ট পাপেট

১৯৫৪ সালে মুস্তাফা মনোয়ার স্কটিশ চার্চ কলেজ ত্যাগ করে কলিকাতা সরকারী আর্ট কলেজের ভর্তি হন। এখানে সমানভাবে চলতে থাকে তাঁর ছবি আঁকা ও গানের চর্চা। আর্ট কলেজের প্রতিবর্ষের পরীক্ষায় তাঁর স্থান ছিল প্রথম।

ছাত্র অবস্থায় দার্জিলিং বেড়াতে যেয়ে দার্জিলিং এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর জল রং-এর কতকগুলি ছবি এঁকে সকলকে তিনি অবাক করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন ইউ. এস, আই, এস-এর পরিচালনায় তাঁর ছবি গুলির উপর ঢাকায় এক প্রদর্শনী হয়। এ প্রদর্শনীই তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম স্বীকৃতি বয়ে আনে।

আর্ট কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা কালীন তিনি একাডেমী অব ফাইন আর্টস আয়োজিত সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে গ্রাফিক আর্টস এ স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ সময় সর্বভারতীয় যুব উৎসবের প্রদর্শনীতেও তাঁর শ্রেষ্ঠ তেল রং এর জন্য তিনি স্বর্ণপদক পান। এ সময় মুস্তাফা মনোয়ারের জল রং এর ছবি ভারতে খুবই সমাদৃত হয়।

১৯৫৯ সালে তিনি কলিকাতা সরকারী আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্টস বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর এই সুসংবাদে আনন্দিত হয়ে ঢাকা আর্টস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তাঁকে ঢাকা আর্টস কলেজে শিক্ষকতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ময়মনসিং এর মেয়ে মেরীর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

টেলিভিশনের শুরুতেই ১৯৬৪ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের ষ্টেশন প্রডিউসার হিসাবে যোগদেন এবং পরবর্তীতে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পারফর্মিং আর্টস একাডেমী, জাতীয় সম্প্রচার একাডেমী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম উন্নয়ন কর্পোরেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুস্তাফা মনোয়ারের প্রচেষ্টায় টেলিভিশনের গতানুগতিক অনুষ্ঠান মালার এক আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়। টেলিভিশনে "নতুন কুড়ি" অনুষ্ঠান সংযোজন তাঁর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসাবে স্বীকৃত। সেক্সপিয়ারের "মুখরা রমনী বশীকরণ" ও রবীন্দ্রনাথের "রক্ত করবী" নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার দেশে অনুষ্টিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলির পরিকল্পনা ও পরিচালনা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন



"রক্তকরবী" নাটকের পরিচালক হিসাবে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন মুস্তাফা মনোয়ার

মুস্তাফা মনোয়ারের উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক সৃষ্টি "পাপেট"। বাংলাদেশ থিয়েটার পাপেট এন্ড এনিমেশনের তিনি পরিকল্পক, গবেষক ও উদ্ভাবক। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত তাঁর পাপেট এর মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান "ক ও খ" জাপানে ও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের টি, ভি অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮২ সালে তিনি কলম্বোয় এনিমেশন এন্ড পাপেট ফর টেলিভিশন' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিষেশজ্ঞ হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ঢাকায় জাতীয় ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাফ-গেমসের জন্য তাঁর উদ্ভাবিত "মিশুক" যা বৃহৎ আকারের চলমান পাপেটরূপে সকলের নিকট জনপ্রিয় ও অত্যান্ত প্রশংসনীয়।

তাঁর উদ্ভাবিত পাপেট আন্তর্জাতিক মানের। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি-ই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাকে ইউ, এন, আই, এম, এর সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

মুস্তাফা মনোয়ার পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের জন্য জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, শ্রীলংকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি সরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের উপনেতা হিসাবে হংকং , থাইল্যান্ড এবং দলনেতা হিসাবে উত্তর কোরিয়া ও চীন সফর করেন।

প্রতিবাদী শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, ভাষা আন্দোলন সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ভারতে অবস্থানকালীন বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করেন।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন শাখায় বিচরণকারী মুস্তাফা মনোয়ার স্বদেশের সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তিকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আজীবন দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছেন।



মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান

[১৯৪৩ খ্রীঃ–]

মাটির বুকে জন্মে বৃক্ষ বাড়েমাটির পরে
আপন ছায়া দিয়া বৃক্ষ মাটি শীতল করে
ওরে–পীরিত নামের বিষ বৃক্ষ জন্মিল তোর বুকে
ওসে, না দেয় ছায়া না দেয় মায়া
পোড়ায় সর্বক্ষণ মনরে– ওরে মন।

'দেবদাস' ছায়াছবিতে মৃত্যুপথযাত্রী দেবদাস চলেছে পার্বতির সঙ্গে দেখা করতে। গরুর গাড়ির চালক আপন মনে যে গান গেয়ে চলেছে–তা যেন দেবদাসেরই সমস্ত জীবনের বেদনা–কান্না হয়ে গুমরে মরছে। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত এই গানের গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান যশোরের কৃতি সন্তান।

যশোরের খড়কীর মোহাম্মদ সাহাদাত আলী ও বেগম সাজেদা খাতুনের নয় ছেলের দ্বিতীয় মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান ১৯৪৩ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারী নানা বাড়ী ঝিনাইদহের ফুরসুন্দি লক্ষীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। লেখাপড়া শুরুকরেন যশোর জেলা স্কুলে। স্কুলে পড়া অবস্থাতেই ছড়া–কবিতা–গল্প এবং গান–রচনা শুরু করেন।

স্কুল বার্ষিকী, স্থানীয় পত্র পত্রিকা এবং এমনকি ঢাকার পত্র পত্রিকাতেও তার লেখা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয় স্কুল জীবন থেকেই। শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন কলেজে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ষাটের দশকের তরুণ কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তখন ঢাকার অগ্রণী পত্রিকা সমূহ যেমন 'সমকাল' 'পরিক্রমা' পলিমাটি ইত্যাদিতে তার লেখা প্রকাশিত হয়। কলেজ জীবনে সাহিত্য প্রতিযোগিতায়–স্বরচিত কবিতা, গল্প, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদিতে তার পুরস্কার ছিল বাঁধা।

একই সময়ে তিনি নাটক লেখা ও ছবি আঁকা শুরু করেন। কলেজের বার্ষিক নাট্যোৎসব সহ যশোরের বিভিন্ন ক্লাবে এ সময় তাঁর রচিত নাটক নিয়মিত মঞ্চস্থ হ'ত। সে সব নাটকের নির্দেশণা এবং প্রধাণ ভূমিকায় অভিনয়ও করতেন তিনি।



শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান।

গানের প্রতি ছিল তার সহজাত আকর্ষণ। এই আকর্ষণই তাঁকে গান রচনার প্রতি বেশী প্ররোচিত করতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ঢাকা টেলিভিশন তাকে অনুমোদিত গীতিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৬৭ সালে টেলিভিশনে তার রচিত নাটক 'অনির্দ্দেশ রং' প্রচারিত হয়। সেই থেকে টেলিভিশনে গীতিকার ও নাট্যকার হিসাবে তার যাত্রা শুরু।

ইতি মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স সহ এম, এ, শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৮ সালে যোগদান করেন তদানিন্ত রেডিও পাকিস্তানে। ১৯৬৮ সাল থেকে এ যাবত তিনি রেডিওতেই তার চাকরী জীবন অতিবাহিত করছেন। অনুষ্ঠান প্রযোজক, অনুষ্ঠান সংগঠক, সহকারী পরিচালক, উপ–পরিচালক পদে চাকরী করেছেন দেশের প্রায় সকল বেতার কেন্দ্রে। এই সময় কালে একাধারে গীতিকার, কবি, নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, উপস্থাপক, আবৃত্তিকার হিসাবে রেডিও–টেলিভিশন–মঞ্চে তার খ্যতি ছড়িয়ে পড়ে। চিত্রাংকনের সৌখিন চর্চাও চলতে থাকে পাশাপাশি। বেশ কিছু বই তার অংকিত প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সোভিত হয়। বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় তিনি নিয়মিত অলঙ্করণ করেন। চলচ্চিত্রে গান লেখার আহবান আসে ১৯৭২ সালে। গান লিখতে লিখতেই নাট্যকার রফিকউজ্জামান জড়িয়ে পড়েন চিত্রনাট্য রচনায়। চলচ্চিত্রের জন্যে ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন সর্বাপেক্ষা সফল কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা ও গীতিকার।

এদেশের চলচ্চিত্রের মূল স্রোত বণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মধ্যেই তিনি সুস্থতা এবং কখনো কখনো সামাজিক কুসংস্কার ভাঙার বক্তব্য আনতে প্রয়াসী হন। জীবিকার জন্যে মানুষের মানবেতর জীবন যাপনের কাহিনী লেখেন তিনি 'জোকার' ছবিতে। 'তালাক' ছবিতে গ্রামের স্বার্থন্বেষী মহলের দ্বারা তালাকের অপব্যবহারের প্রতিবাদ ধ্বণিত করেন।

তাঁর রচিত পঞ্চাশাধিক কাহিনী সংলাপ চিত্রনাট্যের প্রায় প্রতিটি ছবিই বাণিজ্যিক ভাবে সফল তার মধ্যে সোহাগ, ঘরসংসার, বৌরানী, সানাই, বদনাম, সৎভাই, ঈমান, কাজললতা, ছুটির ঘন্টা, নিশানা, ইন্সপেক্টর, অবদান, তওবা, সহযাত্রী, মর্যাদা, আদেশ, প্রতিঘাত, অগ্নিতুফান, এ্যাকসিডেন্ট, বন্ধন, আজকের হাঙ্গামা, আত্মবিশ্বাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশে সাহিত্য নির্ভর যে সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তার প্রায় সব কটিরই গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে বিরহব্যথা; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' অবলম্বনে 'কাঠগড়া' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' চন্দ্রনাথ, শুভদা, রাজলক্ষী শ্রীকান্ত এবং বৈকুণ্ঠের উইল অবলম্বনে সৎভাই।

এর মধ্যে দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা ছবিতে গান রচনা করে তিনি তিনবার শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে জাতীয় পুরস্কার এবং সাংবাদিক বৃন্দের প্রতিষ্টান 'বাচসাস' পুরস্কার লাভ করেন।

জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাকে শ্রেষ্ঠগীতিকার, দশকের শ্রেষ্ঠগীতি রচয়িতা, প্রভৃতি পদক সহ সংবর্ধনা প্রদান করে।

১৯৬৬ সালের ১২ই জুন তাঁর বিবাহের তারিখ। স্ত্রী জিন্নাত আরা জামান এবং দুই কন্যা সানজিদা শারমিন জামান (স্নিগ্ধা) এবং সুহানা শারমিন জামান (পৃথা) কে নিয়ে তাঁর সুখের সংসাব।

সংক্ষিপ্ত তথ্যঃ–

১। প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ঃ কোথায় লুকোব মুখ।

২। প্রকাশিত পংক্তিমালা সংকলন ঃ প্রেম সুখ অসুখের পদাবলী।

৩। প্রকাশিতব্য গীতি সংকলন ঃ ভালবাসার সুখ অসুখ।

৪। রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত গানের সংখ্যা ঃ সহস্রাধিক।

৫। রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত নাটকের সংখ্যাঃঅর্দ্ধশতাধিক

৬। রেডিওতে অভিনিত ও পরিচালিত নাটকের সংখ্যা ঃ শতাধিক

৭। টেলিভিশনে অভিনিত নাটকের সংখ্যা ঃ পঁচিশটি

৮। রেডির ও টিলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিয়মিত উপস্থাপক

৯। বাংলাদেশ গীতি কবি সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।

১০। বাংলদেশ সংগীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব

১১। বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি পরিষদের উপদেষ্টা।

১২। চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনীসংলাপ চিত্রনাট্য রচনার সংখ্যাঃ পঞ্চাশাধিক।

১৩। চিত্র পরিচালক হিসাবে পরিচালিত ছবি 'জন্মদাতা'।

১৪। বাংলাদেশ আবৃত্তিকার সংঘের সদস্য।

১৫। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবৃত্তি ও উচ্চারণ প্রশিক্ষক।

১৬। বেতারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১৯৮৬ সালে পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থান কালে হোটেল রাইন গোল্ড ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে "গেষ্ট অব দি ইয়ার" সনদ প্রদান কারে। তিনিই প্রথম এশীয়–যিনি এই আন্তর্জাতিক হোটেল থেকে এই সম্মান লাভ করেন।

১৭। বেতার ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি ভয়েস অব জার্মানীতে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হন।



"জন্মদাতা" ছবির পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন শিল্পী রাজ্জাক ও গোলাম মুস্তাফাকে।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান বর্তমানে গানের ভেতর দিয়েই তার জীবনসত্য প্রকাশে আগ্রহী সবচেয়ে বেশী। শেষ জীবনে সুরকার হিসাবে আত্মপ্রকাশেরও বাসনা রাখেন। শেষ কথাও উচ্চারণ করতে চান তিনি গানে ঃ-

যেখানে-এসে জীবন হঠাৎ মুছবে আমার নাম-
সেখানে এই বুক থেকে চাঁদ
দুটি চোখ থেকে দুটিনীল তারা জ্বলবে
ওরা বলবে
কবির প্রেমের স্বপ্ন হয়ে আমরা র'য়ে গেলাম
সেখানে এসে দাঁড়িও একটু থেমে
দেখবে তোমার বুকের ভিতর জোছনা আসবে নেমে
তোমার ব্যস্তদিনের মধ্যে না হয় ভেবো
সেদিনাটা বিশ্রাম।।



সন্ধ্যা রায়

[১৯৪৬ খ্রীঃ–]

একটি ছোট খাটো কিন্তু অসম্ভব মায়াবী মিষ্টি মুখের কিশোরী পায়রা উড়িয়ে গেয়ে উঠলেন পায়রার মত শুভ্র উচ্ছ্বলতায়– "ও বাকবাক বাকুম বাকুম পায়রা"....। আর প্রেক্ষাগৃহ ভরা দর্শক আবিষ্কার করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের আগামী দিনের এক উজ্জ্বল নায়িকাকে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানে ঠোঁট মিলিয়ে বাকবাকুম করে ওঠা সেই কিশোরীর নাম–সন্ধ্যা রায়। আর ছবির নাম "মায়ামৃগ"।

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তীর নায়ক উত্তম কুমারের পাশাপাশি বিশ্বজিতের বিপরীতে "মায়ামৃগ" ছবি দিয়ে চলচ্চিত্রের নায়িকা জীবন শুরু হল এক অসামান্য অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের। যদিও তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা ১৯৫৮ সালে রাজেন তরফদারের পরিচালিত "অন্তরীক্ষ" ছায়াছবির মাধ্যমে। "মায়ামৃগ" ছবিতে অভিনয়ের পর আর পেছন ফিরে তাকাননি। একেরপর এক– বিজয় মাল্য নিয়ে অগ্রযাত্রা।

১৯৪৬ সালে নবদ্বীপে মামা বাড়ীতে জন্ম সন্ধ্যা রায়ের পৈত্রিক নিবাস যশোরের 'বেজপাড়াতে'। সেই সময়ের শান্ত সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র মফস্বল শহর যশোরেও দেশ বিভাগের অস্থিরতা আছড়ে পড়েছে। তবু তারই মধ্যে বাল্যকালের দিনগুলো শান্তভাবেই কেটেছে সন্ধ্যারায়ের। শৈশবকলেই তাঁর মাতৃ ও পিতৃ বিয়োগ ঘটে। এই জন্য তাঁর লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়।

তারপব দেশত্যাগের হিড়িক। সন্ধ্যা রায়ও এক সময় চলে যান পশ্চিমবঙ্গে। প্রথমে নবদ্বীপে এবং পরবর্তীতে কলকাতায় আত্মীয় স্বজনের নিকট বসবাস শুরু করেন।



পালংক ছবিতে সন্ধ্যারায়ের সাথে আনোয়ার হোসেন।

যশোবের স্মৃতি আজ অত উজ্জ্বলভাবে সন্ধ্যারায়ের মনে না থাকলেও শিল্প সাহিত্যের এই চিরকালীন নন্দনভূমির মায়া তাঁর সারাটা মনজুড়ে আছে আজও। 'যশোর' বা যশোরের লোক শুনলেই আজও চিত্ত চঞ্চল হয়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও যশোরের অপরিচিত কোন মানুষ আজও তাঁর আপনজন হয়ে ওঠে। সেই নির্বাক যুগ থেকে এপর্যন্ত কলকাতার চলচ্চিত্র জগতে যশোরের কে কোথায় আছেন তা বলে যান মুখস্তপ্রায়।

সন্ধ্যা রায়কে সহজাত অভিনয় প্রতিভার অধিকারী শিল্পী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। কত বিচিত্র ছবিতে তিনি কত বিচিত্র চরিত্রের সহজ রূপায়ন করেছেন। ছবি করেছেন কলকাতায় - বোম্বেতে এবং ঢাকায়।

ঢাকায় তিনি দুটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায় "পালংক" তার জীবনের স্মরণীয় ছবি। এ ছাড়া কাজী জহিরের পরিচালনায় 'ফুলের মালা' নামে একটি বাণিজ্যসফল ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত হিন্দী ছবি একটি "আসলী নাকলী"। মুলতঃ প্রায় সত্তুর-আশি এবং এই চলমান নব্বুই এর দশকে অর্থাৎ ত্রিশাধিক বছর ধরে দাপটের সংগে কলকাতার অসংখ্য বাংলা ছবিতে অভিনয় করে নিজের জন্যে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তিনি গ'ড়ে নিয়েছেন। সুচিত্রা, সাবিত্রি, সুপ্রিয়া, অরুন্ধূতি, অপর্না প্রমুখ নায়িকাদের মধ্যে নিজের অবস্থান করে নেওয়া অসম্ভব কঠিন কাজ হলেও সন্ধ্যারায় তা করেছেন সহজে, সহজাত প্রতিভার কল্যাণে এবং আজো তা ধরে রেখেছেন তার মিষ্টিমুখের লাবণ্যে যা একেবারেই বাঙ্গালীর চিরন্তন প্রতিমা।



"ফুলের মালা" ছায়াছবিতে সন্ধ্যা রায় ও আলমগীর।

তার অভিনীত অসংখ্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবির সংখ্যাও কম নয়। বিশেষ করে উত্তমকুমারের বিপরীতে "তিন অধ্যায়", "ভ্রান্তি বিলাস", "সূর্যতাপ" প্রভৃতি ছবির নাম উল্লেখ করতেই হয়। তবে বেশী ছবি তার বিশ্বজিত, সৌমিত্র এবং অনুপকুমারের সঙ্গে। বিশ্বজিৎ ও সৌমিত্রের বিপরীতে "মনিহার" তাঁর অসাধারণ ব্যবসা সফল ছবি।

তার অভিনয় প্রতিভার স্ফুরন সমৃদ্ধ ছবিও অনেক। "পালংক", "গঙ্গা", "বাঘিনী", "সংসার সীমান্তে", "নিমন্ত্রণ", "দ্বীপের নাম টিয়া রং" এবং বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অমর ছবি 'অশনী সংকেত' তাকে অমর করে রাখবে আগামী প্রজন্মের কাছেও।

১৯৬৭ সালে সন্ধ্যারায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন গুনী পরিচালক তরুন মজুমদারের সঙ্গে। দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ বিবাহ জীবন অতিবাহিত হয়েছে টালিগঞ্জের "সন্ধ্যানীড়ে"। শিল্পী জীবনের পরমারধ্য শিল্পচর্চাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা- যে সাধনা তাকে পরিচিতি দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে অসংখ্য পুরস্কারে। পুরস্কার আজও রয়েছে তার প্রতীক্ষায়।

যশোরের তিন কন্যা

সুচন্দা- ববিতা-চম্পা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র জগতের তিন সময়ের প্রধান নায়িকা। তিন সহোদরা চলচ্চিত্রে যে যখন পা দিয়েছেন-'এসেছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন'।

যশোরের বিজয়নগর গ্রামের এক সংস্কৃতি অনুরাগী পরিবারে তাঁদের জন্ম। বাবা নিজামুদ্দীন আতাউব এবং মা ডাঃ বি, জে, আরা (জাহানারা বেগম বাঁশী) ছিলেন বিশেষ ভাবে শিল্প সাহিত্যমনা। বিশেষ করে মা ডাঃ বি, জে, আরা সাহিত্য চর্চা করতেন। যশোর সাহিত্য সংঘের সাহিত্য সভায় তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন ষাটের দশকে। ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে তাঁরা বসবাস শুরু করেন সার্কিট হাউজের বিপরীতে "রাবেয়া মঞ্জিলে"।

এই পরিবারের তিন কন্যা সংযুক্ত হলেন সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রের সঙ্গে।



ছবিতে বড় বোন সুচন্দার সঙ্গে ববিতা ও চম্পা।



সুচন্দা

কোহিনুর আখতার চাটনী-চাকুরীজীবী পিতার সাতক্ষিরা অবস্থানকালে তাঁর জন্ম সাতক্ষিরাতে। তবে বাল্যকাল থেকে কৈশরের শেষসীমা পর্যন্ত কেটেছে যশোরেই। যশোরের মোমিন গার্লস স্কুল (সরকারী বালিকা বিদ্যালয়) থেকে এস, এস, সি পাস করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হন যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন কলেজে। ইতিমধ্যে তিনি কিশোরী নৃত্যশিল্পী হিসাবে যশোরে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর নৃত্য প্রদর্শন এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে তত দিনে।

যশোরে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় চলচ্চিত্রে ডাক আসে। সেকারণেই পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ঢাকা সিটি কলেজ থেকে। পরিবারের সংস্কৃতিমনষ্কতা এবং নিজের নৃত্য প্রতিভাই সম্ভবতঃ তাঁর মধ্যে সহজাত অভিনয় শিল্পীকে জাগ্রত করেছিলো।

১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রে যুক্ত হল একটি নতুন নাম, 'সুচন্দা'।

প্রথম ছবি 'কাগজের নৌকা' পরিচালক সুভাষদত্ত। প্রথমেই নায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রথম ছবিতেই বিরাট সাফল্য। ডাগর চোখের সুন্দরী কিশোরী এক কোহিনুর আখতার 'সুচন্দা' নাম নিয়ে এলেন এবং জয় করলেন চিত্র জগত ও অসংখ্য চিত্রামোদীদের হৃদয়।

এরপর আর থেমে থাকতে হয়নি; পিছনে তাকাতে হয়নি এক মুহূর্তের জন্যেও।এই সময়ে তাঁর জীবনে ঘটে যায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ জহির রায়হানের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় পরিণত হয় প্রণয়ে, আর প্রণয় থেকে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৮ সালে শুভ বিবাহে রূপ নেয়।



'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে সুচন্দা ও রাজ্জাক।

জহির রায়হানের পরিচালনায় সুচন্দার প্রথম ছবি 'বেহুলা'। বিপরীতে নায়ক নবাগত 'রাজ্জাক'। এই ছবি থেকেই রাজ্জাক-সুচন্দা রোমান্টিক জুটির জন্ম। একের পর এক এই জুটির ছবি নির্মিত হয়েছে- এবং প্রতিটি ছবিই সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল করেছে সুচন্দা রাজ্জাক জুটির জয়যাত্রা। সেদিনের চলচ্চিত্র দর্শকদের কেউই সম্ভবতঃ সাহিত্য নির্ভর ছবি 'আনোয়ারা' তে সুচন্দা রাজ্জাকের মর্মস্পর্শী অভিনয়ের কথা ভুলতে পারেননি আজও। রাজ্জাক ছাড়াও সুচন্দা যে সমস্ত নায়কের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নাম 'আজিম' কাজী জহির পরিচালিত 'নয়নতারা' ছবির অবিস্মরণীয় ব্যবসায়িক সাফল্য আজিম সুচন্দাকেও নির্ভর যোগ্য জুটি হিসাবে পরিচিতি দেয়।

তখন প্রথম দিকে ভারতীয় হিন্দী ও বাংলা ছবি এবং পাকিস্তানের উর্দ্দু ছবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে টিকে থাকতে হত এদেশের চলচ্চিত্রকে। তাই এমন কি নন্দিত পরিচালক জহির রায়হানকেও 'কখনো আসেনি' 'কাঁচের দেওয়াল' প্রভৃতি নিরীক্ষাধর্মী ছবি নির্মাণ ছেড়ে বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণে হাত দিতে হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানী উদ্ভট নাচগান-মারপিট কন্টকিত উর্দ্দু ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যিক হলেও রুচি রক্ষাই ছিল তখন এদেশের ভাল পরিচালকের প্রধান কাজ। সেই ভাবেই নির্মিত হয়েছে এবং সফল হয়েছে 'আগুন নিয়ে খেলা', 'দুই ভাই' প্রভৃতি অনেক ছবি- যার অধিকাংশের নায়িকা ছিলেন সুচন্দা।

১৯৬৯ এর গণ-অন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জহির রায়হান নির্মাণ করলেন তাঁর জীবনের সমাপ্ত করে যাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি "জীবন থেকে নেয়া"। শিল্প মানের দিক থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিতে না পারলেও প্রতিবাদের ভাষা এ ছবিতে যে প্রখর প্রচণ্ডতা পেয়েছিলো- তা প্রভাবিত করেছিলো এদেশের আপামর জনসাধারণকে। সে ছবিরও প্রধান নায়িকা ছিলেন সুচন্দা।

১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সুচন্দাকে নিয়ে স্বামী জহির রায়হানকে আশ্রয় নিতে হয় ভারতে। দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধের পর প্রার্থীত বিজয় এলো। দেশে ফিরলেন সুচন্দা-স্বামী জহির রায়হানকে নিয়ে। তারপরই হঠাৎ একদিন এলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক- মর্মভেদী-অবিস্মরণীয় দূর্ভাগ্যের দিন। ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

বড়ভাই উপন্যাসিক, সাংবাদিক শহীদ শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে খোঁজ করতে যেয়ে নিখোঁজ হলেন এদেশের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে প্রজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জহির রায়হান, উপন্যাসিক জহির রায়হান, গল্পকার জহির রায়হান, সচেতন রাজনীতিক জহির রায়হান, প্রকৃত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান- সুচন্দার স্বামী জহির রায়হান।

সুচন্দা ১৯৬৫ থেকে এযাবত শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন বিচিত্র ধরণের চরিত্রে। এখনো অভিনয় করছেন- তবে অভিনয়ের চেয়ে নিজের প্রযোজনা সংস্থা "সুচন্দা চলচ্চিত্র" নিয়েই বেশী ব্যস্ত এখন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছবি নির্মাণ করেছেন সফল প্রযোজক হিসাবে।

সুচন্দা পুত্র তপু রায়হান মায়ের অনুপ্রেরণায় ও পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে রায়হান মুজিব পরিচালিত "প্রেম প্রীতি" ছায়াছবির নায়ক হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সুচন্দা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশের। এদেশের চলচ্চিত্রে- যশোরের বিশিষ্ট শিল্পী সুচন্দাকেই পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।



ববিতা

ফরিদা আখতার, পপি। চলচ্চিত্রে আসেন মূলত বড়বোন সুচন্দার অনুপ্রেরণায় ১৯৬৮ সালে। প্রথম ছবি বড় বোনের স্বামী জহির রায়হানের 'সংসার' এ তিনি ছিলেন কিশোরী শিল্পী। চলচ্চিত্রে তাঁর নাম হল 'ববিতা' কিশোরী শিল্পী হিসাবে যাত্রা শুরু করার পর দ্বিতীয় ছবিতেই একক নায়িকা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন 'পিচ ঢালা পথ' ছবিতে।

ববিতা তাঁর নায়িকা জীবনে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বৈচিত্রময় চরিত্রে অভিনয় করেছেন একের পর এক। অবিসম্বাদিত গ্লামার ও সৌন্দর্য তাঁকে কেবল স্বপ্ন দেবীর চরিত্রে আবদ্ধ রাখতে পারেনি।

"অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী"র বর্বর পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিতা মেয়েটির দুরুহ চরিত্র দিয়ে যে বৈচিত্রের সন্ধান শুরু তা একের পর এক- 'ডুমুরের ফুল' এর নার্স, 'বসুন্ধরা'র কুমারী মাতা, 'গোলাপী এখন ট্রেনে'র সমাজ নির্যাতিতা গোলাপী, 'সুন্দরী'র ঝগড়াটে কিন্তু জীবন-বঞ্চিতা সুন্দরী ইত্যাদি চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি জাতীয় ভাবে। তাঁর অভিনয়, প্রতিভার চূড়ান্ত স্বীকৃতি আসে-যখন বিশ্ব নন্দিত, বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর "অশনী সংকেত" ছবির নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে তাঁকে আহবান জানান।

'অশনী সংকেত' ছবির 'অনঙ্গ বৌ' চরিত্রে ববিতার অভিনয় ববিতাকে যেমন আন্তর্জাতিক শিল্পীর মর্যাদা দেয় তেমনই এদেশের চলচ্চিত্রের শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয়ও তুলে ধরে বিশ্ব সভায়।

ববিতা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালের ৩০ শে জুলাই বাগেরহাটে। শৈশব ও কৈশরের প্রথমার্ধ কেটেছে যশোর শহরের রাবেয়া মঞ্জিলে। পড়াশোনা করেছেন যশোর দাউদ পাবলিক স্কুলে। স্কুলে পড়ার সময়েই বড় বোনের চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠার সূত্রে সপরিবারে চলে আসেন ঢাকায়। গেন্ডারিয়ার বাড়ীতে শুরু হয় কৈশরের অবশিষ্টাংশ। চলচ্চিত্রে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট অর্জন না করলেও- ববিতা ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। দক্ষতা অর্জন করেন ইংরেজী সহ বেশ কিছু বিদেশী ভাষায়। নিজেকে পরিমার্জিত করে তোলেন একজন আদর্শ শিল্পীর মাত্রায়।



শ্রেষ্ট অভিনেত্রী হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হাতে ববিতা।

ববিতা অভিনীত ছবির সংখ্যা দুই শতকেরও অধিক। ষাটের দশকের শেষ সময় থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত, কি শিল্প মনষ্ক ছবি, কি বাণিজ্যিক ছবি সব খানেই তাঁর সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি তাঁর চরিত্র চিত্রনের বৈচিত্রময় দক্ষতা প্রমান করেছে। কখনো গ্রামের মেয়ে, কখনো রাজকন্যা, কখনো পকেটমার, কখনো মধ্যবিত্ত সংগ্রামী নারী, কখনো জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্থ মেয়ে, কখনো রূপকথার স্বপ্নকন্যা, কখনো প্রেমিকা সর্বত্রই সমস্ত চরিত্রেই তাঁকে গ্রহণ করেছে দর্শক বিশ্বাসযোগ্য ভাবে।

অভিনয়ের পাশাপাশি ববিতা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব চলচ্চিত্র সংস্থা "ববিতা মুভিজ"। প্রযোজনা করেছেন বেশ কিছু ব্যবসায়িক সফল ছবি।

ববিতা সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নায়কের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। রাজ্জাক, জাফর ইকবাল, উজ্জ্বল, আলমগীর, ওয়াসিম, ফারুক, ইলিয়াস কাঞ্চন, সুব্রত, জসিম, সোহেল রানা, জাভেদ প্রমুখ বাংলাদেশী নায়কবৃন্দ ছাড়াও ভারতের সৌমিত্র চট্টোপধ্যায়, পাকিস্তানের নাদিম, জাভেদ, ফয়সল ইত্যাদি নায়কের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি।

জুটি হিসাবে বিভিন্ন সময়ে রাজ্জাক-ববিতা, ববিতা-জাফর ইকবাল, ববিতা-উজ্জ্বল, ববিতা-ফারুক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো।

রাজ্জাকের সঙ্গে অনন্ত প্রেম, বাঁদী থেকে বেগম, বদনাম, সোহাগ, সুখে থাকো, লায়লী-মজনু, তালাক, বিরহ ব্যথা, ফুলশয্যা। জাফর ইকবালের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, হারজিত, ফকির মজনু শাহ, অবুঝ হৃদয়, প্রভৃতি। ফারুকের সঙ্গে, গোলাপী এখন ট্রেনে, কথা দিলাম ইত্যাদি ছবি ব্যবসায়িক সাফল্যে ভাস্বর। প্রচুর বাণিজ্যিক ছবি করা সত্বেও ববিতার প্রকৃত পরিচয় নন্দনতাত্বিক ছবির শিল্পী হিসাবে। এদেশের সমস্ত খ্যাতিমান পরিচালকের নির্দেশনায় তিনি অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে জহির রায়হান, চাষী নজরুল ইসলাম, সুভাষ দত্ত, আমজাদ হোসেন, কবির আনোয়ার প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ববিতা এদেশের একমাত্র শিল্পী যিনি বার বার আমন্ত্রিত হয়েছেন পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান ও পুরস্কারে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অশনি সংকেত' ছবিতে 'অনঙ্গ বৌ' চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কার সহ ১৯৭৩ সালে ভারতের বেংগল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন এর পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি অনবদ্য অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের ওয়ার্ল্ড ডেভোলাপমেন্ট পার্লামেন্ট কর্তৃক "ডকট্রেট" উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি 'বাঁদী থেকে বেগম', ১৯৭৬ সালে 'নয়ন মনি' ১৯৭৭ সালে 'বসুন্ধরা' ও ১৯৮৮ সালে 'রামের সুমতি' ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।



"অশনি সংকেত" ছাবর পবিচালক সত্যজিৎ রায় ববিতাকে ছবির দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এ ছাড়াও তিনি চারবার বা, চ, সা, স, ইত্যাদি সহ বিয়াল্লিশটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বারবার যোগদান সহ তিনি কায়রো, রোম, বার্লিন, যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লাভাকিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ব্রাজিলে বিশেষ ভাবে সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পী হিসাবে বিশ্বমানের মেধার পরিচয় আছে ববিতার।



চম্পা

গুলশান আরা আখতার চম্পা। নিজের পারিবারিক ডাক নামেই চলচ্চিত্রে এসেছেন।

অভিনয়ে হাতে খড়ি টেলিভিশনের নাটক দিয়ে। সামনে তো বড় দুই বোন, পথিকৃৎ 'সুচন্দা' ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না 'ববিতা' ছিলেনই।

টেলিভিশনের 'এখানে নোঙ্গর' নাটকের পরই সমস্ত শিল্পী মহল একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রীর আবির্ভাব বুঝতে পারেন। একটি ছিন্নমূল পরিবারের যুবতী মেয়ে যে বিভিন্নজনের লালসার কেন্দ্রবিন্দু অথচ ভালবাসে আর এক ছিন্নমূল যুবককে-এমন একটি দূরহ চরিত্রে সাবলীল দক্ষতায় অভিনয় চম্পাকে আলোচিত করে তোলে।

বড়বোন সুচন্দার প্রযোজনা সংস্থা 'সুচন্দা চলচ্চিত্রের' প্রথম ছবি "তিন কন্যা" তে বড় বোনের সঙ্গে চম্পা প্রথম ছায়া ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রথম ছবির স্মরণীয় সাফল্যই তাঁকে এনে দিয়েছে চলচ্চিত্র জগতের জয়মাল্য।

চম্পা চলচ্চিত্রে আসেন ১৯৮৬ সালে। সেই থেকে এ যাবত অর্ধ শতাধিক ছবিতে অভিনয় করে নিজেকে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন নায়িকায় পর্যবসিত করতে পেরেছেন।তিনকন্যার পরপরই প্রচন্ড সাফল্য আসে 'সহযাত্রী' এবং 'ভেজা চোখ' ছবিতে।

চম্পা এযাবৎ যত নায়কের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইলিয়াস কাঞ্চন এবং জাফর ইকবাল। এর মধ্যে ইলিয়াস কাঞ্চন-চম্পা জুটির প্রায় সমস্ত ছবিই ব্যবসা সফল।

চম্পা প্রথম থেকেই বৈচিত্রাভিলাসী। চরিত্রের প্রয়োজনে কোন রূপসজ্জা গ্রহণ ছাড়াই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হন না।

ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালক গৌতম ঘোষ। "পদ্মানদীর মাঝি" নির্মাণ করতে যেয়ে দুরূহ চরিত্র মালা'র ভূমিকায় চম্পাকে মনোনীত করেন। ভাল ছবি করার তৃষ্ণায় চম্পা দেশের ব্যস্ততম নায়িকা হওয়া সত্ত্বেও 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে প্রয়োজনীয় সময় দেন এবং যত্নের সঙ্গে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে ভূয়শী প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক শিল্পীর সম্মান।



'লটারী' ছবিতে চম্পা ও ববিতা

চম্পা অভিনীত উল্লেখযোগ্য এবং ব্যবসা সফল ছবির তালিকা বিশাল। তার মধ্যে তিনকন্যা, সহযাত্রী, ভেজাচোখ, নিষ্পাপ, দুর্ণাম, বিরহ ব্যথা, অবুঝ হৃদয়, প্রেম প্রতিজ্ঞা, মাটির কসম, বন্ধন, জন্মদাতা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

চম্পা, বড় বোন ববিতার সঙ্গে আমজাদ হোসেন পরিচালিত "গোলাপী এখন ঢাকায়" ছবিতে অভিনয় করছেন গোলাপীর বোন আলাপীর চরিত্রে। ডানপিটে প্রায় রাস্তার মেয়ে আলাপী হিসাবে চম্পার অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

চম্পা আশির দশকে চলচ্চিত্রে এলেও নবীন প্রজন্মের নায়কবৃন্দ ছাড়াও পুরানো প্রজন্মের রাজ্জাক, আলমগীর প্রমুখ নায়কের বিপরীতেও অভিনয় করেছেন। চম্পার চলচ্চিত্র জীবন এখন মধ্যগগনাভিমুখী। আশা করা যায় আরো দীর্ঘ পথ তিনি পাড়ি দেবেন সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

টেলিভিশনের পর্দায় বড় মাপের অভিনেত্রী হবার যে সম্ভাবনা তিনি দেখিয়েছেন "পদ্মানদীর মাঝি" এবং "গোলাপী এখন ঢাকায়" এর অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই সম্ভাবনাকে শুধু বাস্তবায়িতই নয় মহিমান্বিতও করবেন এমন বিশ্বাস পোষণ করার সঙ্গত কারণ আছে।

তিনি ঢাকা কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলেন এবং সেখান থেকেই এস, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮২ সালে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম খানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ব্যক্তি জীবনে চম্পা ব্যবসায়ী স্বামী ও কন্যা এষাকে নিয়ে রুচিশীল সুখী জীবন-যাপন করছেন।

- ০ -

গ্রন্থটির তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাঁদের সুন্দর ও সুমধুর সান্নিধ্যে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও ধন্য হয়ে উঠতে পেরেছি।

সৈয়দ আলী আহসান	কলাবাগান ধানমন্ডি, ঢাকা
শিল্পী ফিরোজা বেগম	নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা
এস, এম, সুলতান	নড়াইল
প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	ইন্দিরা রোড, ঢাকা
মুস্তাফা মনোয়ার	সেন্ট্রাল রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা
মোস্তফা আজিজ	সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি ঢাকা
ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	উত্তরা, ঢাকা
মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান	হাতিরপুল, ঢাকা
আসাদুল হক	ইষ্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট,ঢাকা
সুচন্দা	সুচন্দা চলচ্চিত্র, ঢাকা
ববিতা	ববিতা মুভিজ, ঢাকা
চম্পা	ইষ্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট ঢাকা
দীপক ভট্টাচার্য	স্বর্গীয় ধীরাজ ভট্টাচার্য "ললিত স্মৃতি" হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলকাতা
অমলা শঙ্কর	জয়জয়ন্তী বালিগঞ্জ, কলকাতা
সমীর কুমার রায় চৌধুরী	বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা
সন্ধ্যা রায়	"সন্ধ্যা নীড়" টালিগঞ্জ, কলকাতা
দীপ্তি ভট্টাচার্য	নিমাই ভট্টাচার্য, দেশপ্রান শাসমল রোড, টালীগঞ্জ,কলকাতা
ময়ুখ বসু	স্বর্গীয় মনোজ বসু বিবেকানন্দ পার্ক, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা

গ্রন্থ	লেখক / সম্পাদক
ডাঃ লুৎফর রহমান রচনাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	সম্পাদনায় ঃ আব্দুস সাত্তার
কবি গোলাম মোস্তফা রচনাবলী	
কবি গোলাম মোস্তফা --	বন্দেআলী মিয়া
বাংলার কবি মধুসূদন	ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম
গীতিকবি শ্রী মধুসূদন -	শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
কবি মধুসূদন	মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত
শিল্পীর ট্রাজেডি	মোবাশ্বের আলী
সাগরদাড়ী ও মধুসূদন	শেখ জহুরুল ইসলাম
কিংবদন্তীর যশোর	মুহম্মদ আবু তালিব
লালন পরিচিতি	মুহম্মদ আবু তালিব
বাউল কবি লালন শাহ—	আনোয়ারুল করীম
হারামণি (পঞ্চম খণ্ড)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
লালন সাহিত্য ও দর্শন	খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)	মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
সংগীতের রূপকার	আসাদুল হক
কবি ফররুখ আহম্মদ রচনাবলী	
ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি --	শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত
বাংলাদেশ সঙ্গীত সিরিজ—২	
কমল দাশগুপ্ত	আব্দুল মতিন
কাজী কাদের নওয়াজ —	ফারুখ নওয়াজ
সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থ—	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোহাম্মদ শাহ কোরেশী (সম্পাদিত)।
যখন পুলিশ ছিলাম—	ধীরাজ ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান —	মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী
ডি. আই. পি	নিমাই ভট্টাচার্য

শিক্ষালয়ের ইতিকথায় যশোর— কাজী শওকত শাহী
সোনার দাগ— গৌরাঙ্গ প্রসাদ দাশ
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস— অনুপম হায়াৎ
রাগ অনুরাগ— রবিশঙ্কর
সংসদ বাঙলা অভিধান
প্রবেশিকা স্মৃতি — জীনাৎ জাহান
যশোর -খুলনার ইতিহাস
(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) শতীশ মিত্র
প্রেম সুখ অসুখের পদাবলী — মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান
নড়াইলের ইহিহাস — মুহাম্মদ মমতাজুর রহমান ও
শরীফ আব্দুল করিম সম্পাদিত

নির্বাচিত চিত্রকলা ঃ বাংলাদেশ

পত্র—পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ভোর, সওগাত, আনন্দ বিচিত্রা, তারকালোক, অপরাধচিত্র, নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ভারত বিচিত্রা, চিত্তা, বেগম, দীপালী (কলকাতা) সানন্দা (কলকাতা) আনন্দলোক (কলকাতা) ক্যালকাটা 'ল' জার্নাল ১৯১৪, বর্তমান রবিবার, কলকাতা। মরমী কথাশিল্পী মনোজ বসুর ৯০ তম জন্মবার্ষিকী সাংস্কৃতিকীর উদ্যোগ।